বিজ্ঞান সাময়িকী

মে - জুন ২০১৯

জিরো টু ইনফিনিটি

যুদ্ধবিগ্রহে প্রযুক্তির বিকাশ

জেনেটিক ভাগ্য গণনা

পৃথিবীর বুকে কৃত্রিম সূর্য

প্যারালাল ইউনিভার্স

ব্ল্যাক হোলের প্রথম ছবি

মে – জুন ২০১৯

সূচিপত্র

ফিচার

যুদ্ধবিগ্রহে চমৎকার এক প্রযুক্তির বিকাশ || ০৫
কৃষ্ণগহ্বরের প্রথম ছবি: অদেখাকে দেখল মানুষ || ১০
ব্ল্যাকহোলের প্রথম ছবি কি আসলেই 'ছবি'? || ১৭
ব্ল্যাকহোলের ছবি তোলার পেছনের গল্প || ২২
মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় জিনিস কী? || ৩০
বিজ্ঞানীরা কীভাবে দূরের গ্রহের ভর মাপেন || ৩২
জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ || ৩৭
জেনেটিক ভাগ্য গণনা || ৪১
১০ মিনিটে ক্যানসার শনাক্তকরণ || ৪৫
তাপগতিবিদ্যার দৃষ্টিতে পাখির পরিযান || ৫১
অগমেন্টেড রিয়্যালিটির জগতে || ৫৬
প্যারালাল ইউনিভার্স || ৬০
পৃথিবীর বুকে কৃত্রিম সূর্য || ৬৫
ভয়েজার: অসীমের পথে মানুষের তৈরি দুই যান || ৭৩
ভীনগ্রহীদের জন্যে মানুষের পাঠানো গোল্ডেন রেকর্ড || ৭৭

রকমারি

মেঘের ভর || ৪৪
চ্যাপ্টা কৃমির অতীত জন্মের স্মৃতি || ৫৫
এক মহাজাগতিক দুর্ঘটনা || ৫৯
গোলমেলে সমীকরণ || ৬৪
স্পেসস্যুট ছাড়া মহাকাশে || ৭২

সম্পাদকীয়

গত ১০ই এপ্রিল বিজ্ঞানপ্রেমীদের মাঝে যেন উৎসবের আমেজ চলছিল। ব্ল্যাক হোলের প্রথম ছবি তোলা হয়েছে। এ নিয়ে হৈ চৈ। আর হবেই বা না কেন? মামুলী একটা ছবি, শুধু একটা ছবিই। কিন্তু এই ছবিতেই আছে মানুষের অসম্ভবকে সম্ভব করার গল্প। আছে যুগের পর যুগ ধরে শত শত বিজ্ঞানীর গবেষণার গল্প। আছে মহাবিশ্বের অপার রহস্যের গল্প, আছে ভবিষ্যতের অচিন্তনীয় সম্ভাবনার গল্প। আছে শত শত ব্যর্থতার ইতিহাস, আছে শত শত কল্পনার ইতিহাস। ছোট একটা ছবির দিকে তাকালে একসাথে অনেক কিছু ভেসে উঠে। মনে হয় এই মহাবিশ্ব অনেক সুন্দর। সেই যুগান্তকারী ছবির নানা গল্প নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের প্রচ্ছদ। পাশাপাশি বিজ্ঞানের অন্যান্য দিক তো আছেই। হ্যাপি সায়েন্স।

সিরাজাম মুনির শ্রাবণ
সম্পাদক, জিরো টু ইনফিনিটি
shrabanmonir@gmail.com

জিরো টু ইনফিনিটি

সম্পাদক
সিরাজাম মুনির শ্রাবণ

সহকারী সম্পাদক
হাসনাত বিন জুবায়ের

বিভাগীয় সম্পাদক
শাহরিয়ার কবির
মুহাম্মদ সামিউল আলম
মুনেম আহমেদ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
লুৎফুন নাহার

বিপণন ব্যবস্থাপনা
আজিজুল ইসলাম
০১৯৯০ ৬১৫ ৪৬৩

ওয়েবসাইট
bn.z2i.org
facebook/bn.z2i
facebook/groups/zero2inf

মূল্য: বিশ টাকা

জিরো টু ইনফিনিটি H/Q
ফ্ল্যাট A-4 (২য় তলা),
৫/২, ব্লক A, লালমাটিয়া, ঢাকা

বিজ্ঞাপনঃ ০১৬৭৭ ১২৩ ৪১৯

bn.z2i.org

বিপণনঃ ০১৬৭৭১২৩৪১৯

ঢাকার বাইরে প্রধান প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র

রাজশাহীঃ চন্দন বুক হাউজ
ফেনীঃ শিক্ষা বিপণী কলেজ রোড
নেত্রকোণাঃ এনাম লাইব্রেরি, ছোট বাজার
ময়মনসিংহঃ মতি লাইব্রেরী, এনাম লাইব্রেরী ছোট বাজার, রুপক লাইব্রেরী, মুক্তা লাইব্রেরি, কৃ.বি.
কুমিল্লাঃ খাদী জোছনা ষ্টোর, কান্দির পাড়
রেলস্টেশনঃ মাহামুদ বুক ষ্টল, হাসান ঈমাম
চট্টগ্রামঃ অন্বেষণ বুক সাপ্লাই, আন্দর কীল্লা
আন্দর কিল্লাঃ সাহিত্য বিচিত্রা ও সংবাদ পত্র বিক্রয় কেন্দ্র
কক্সবাজারঃ খবর বিতান
নিউমার্কেট: সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
জামাল খান রোড বাতী ঘর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ঃ নিউ এডুকেশন, শফি বুকস, শিক্ষাঙ্গন
চুয়েট: পারুল জুয়েলারী
খাগড়াছড়ীঃ প্রতিভা ট্রেডার্স, রাঙ্গামাটি বই একাডেমী
খুলনাঃ ডাক বাংলার মোড়, সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র শান্তী রাম মোড়
সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র ইকবাল রোড
মৃত্তিকা লাইব্রেরী, আহাম্মেদ রোড, কে.ডি. ঘোষ রোড, শরীফ লাইব্রেরী
সিলেটঃ আলী ঘর লাইব্রেরী, আম্বর খান, জসীম পেপার হাউজ, মদীনা মার্কেট
বর্ণমালা লাইব্রেরী, শীবগঞ্জ পয়েন্ট
এল-আর এন্টারপ্রাইজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
মদিনা এন্টারপ্রাইজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
যশোরঃ আনোয়ার আলম ব্রাদার্স, জর্জকোট মোড়
রংপুরঃ ভাই ভাই পেপার হাউস
দিনাজপুরঃ হক পত্রিকা এজেন্সি এন্ড লাইব্রেরী
ফরিদপুরঃ আনন্দ বিপণী ১০ খান সুপার মার্কেট
ঝিনাইদহঃ কোহিনুর লাইব্রেরী মাওলানা ভাষানী
নরসিংদীঃ বই পুস্তক চেয়ারম্যান মার্কেট
মুন্সিগঞ্জঃ রবীন্দ্র নারায়ণ দত্ত পত্রিকা বিতান
সিরাজগঞ্জঃ স্কলার লাইব্রেরী বি.এ কলেজ রোড
ব্রাহ্মণবাড়িয়াঃ আলী লাইব্রেরী টি.এ রোড
রেলষ্টেশন: রিকটো রেলওয়ে বুক স্টল
কুষ্টিয়াঃ বই মেলা নবাব সিরাজদ্দৌলা
টাঙ্গাইলঃ খান বুক হাউজ, এলেঙ্গাঁ: সংবাদ পত্র বিক্রয় কেন্দ্র
জয়পুরহাটঃ রেল ষ্টেশন সংবাদ পত্র বিক্রয় কেন্দ্র
লালমনিরহাটঃ সাখীর আলম সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
সৈয়দপুরঃ নিউজ কেভীন, সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
জামালপুরঃ রেলওয়ে বুক স্টল সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
গাজীপুরঃ স্টুডেন্ট গ্যালারী, ডুয়েট
কিশোরগঞ্জঃ ভাই-বোন লাইব্রেরি
বরিশালঃ কলেজ লাইব্রেরি, বুক ভিলা
কুড়িগ্রামঃ কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ
মৌলভীবাজারঃ পুষ্পিতা পুস্তকালয়
রাজবাড়ীঃ শামীম লাইব্রেরি
গাইবান্ধাঃ সারকুলার রোড পত্রিকা বিতান

ঢাকার প্রধান প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র

মতিঝিলঃ সকল সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
ফার্মগেটঃ সকল সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
আরামবাগঃ সম্প্রীতি লাইব্রেরী জনতা লাইব্রেরী
পীরজঙ্গী মাজারঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র, রাব্বী বুক হাউজ, বিদ্যা সাগর লাইব্রেরী
কমলাপুরঃ আদর্শ শিক্ষা বিপনী
রেলষ্টেশন: সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
টিকাটুলীঃ শেরে বাংলা এবং ইসলামীয়া লাইব্রেরী
যাত্রাবাড়ীঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
লক্ষ্মীবাজারঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
গেন্ডারিয়াঃ ঈমাম সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
চিটাগাং রোডঃ জননী বই ঘর ও ওভার ব্রীজের দুই পাশ সকল সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র।
শনী আখড়াঃ আয়শা মার্কেট সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
ধনীয়াঃ স্টুডেন্ট লাইব্রেরী
মৌচাকঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র, বই বিচিত্রা সিদ্ধেশ্বরী
মালীবাগঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র, রেলগেট সংবাদপত্র
শান্তিনগরঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
রাজারবাগঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
রামপুরাঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র এবং লাইব্রেরী
বনশ্রীঃ আইডিয়াল স্কুলের পাশে সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
খিলগাঁওঃ আইডিয়েল, অংকুর, পিস লাইব্রেরী
বসুন্ধরাঃ বারিধারা গেট সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
নতুন বাজার ও গুলশানঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
বনানী, কাকুলী চার রাস্তার মোড় সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
মহাখালীঃ জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, রেলগেট ও বাসস্ট্যান্ড সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
খিলক্ষেতঃ এয়ারপোর্ট ও রেলষ্টেশন, সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
রাজলক্ষ্মীঃ ফেমীলী বুক, চাঁদনী বুক, তোফায়েল বুক
আজিমপুরঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র ওভার ব্রীজের দুই পাশে বি.আর.টি.সি সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র,
রাজউক কলেজঃ বুক ওয়ার্ল্ডস এম.সি.এম.এল
হাউজ বিল্ডিংঃ ওভার ব্রিজের দুই পাশ, সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
আব্দুল্লাহপুরঃ টঙ্গী ষ্টেশন সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
টঙ্গী কলেজ গেটঃ ইসলামী ও বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী
গাজীপুরঃ আলহেরা লাইব্রেরী, তামরীমুল মিল্লাত মাদ্রাসা
চৌরাস্তা জয়দেবপুর পোষ্ট অফিস সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
আফতাবনগরঃ সুইফট ফটোকপি এন্ড ষ্টেশনারী
শাহবাগঃ বিপনী বিতান/ওষুধ মার্কেট
বুয়েটঃ পলাশী বাজার রাজধানী কনফেকশনারী
নিউমার্কেটঃ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র ১, ২, ৪নং গেট
সিটি কলেজ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
জ্ঞানকোষ ল্যাব এইড সংবাদপত্র নিউজ কর্ণার
জ্ঞানকোষ সোবহানবাগ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র শুক্রাবাদ
হোটেল ভোজন বিলাশ সংবাদপত্র
জিগাতলাঃ মিষ্টি দোকান মোড় সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
ট্রেনারী পাড়াঃ খাম্বার মোড় সংলগ্ন পত্র বিক্রয়
মিরপুরঃ মিরপুর-১ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র ও অঙ্কুর লাইব্রেরী
পোষ্ট অফিস, থানার সামনে, গোলচক্কর
মিরপুর-১০ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র ওভার ব্রীজের সবদিক

যুদ্ধবিগ্রহে চমৎকার এক প্রযুক্তির বিকাশ

মুনেম আহমেদ
বিভাগীয় সম্পাদক, জিরো টু ইনফিনিটি
facebook.com/monemahmad.kishor

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ম্যানহাটান প্রকল্পের পর সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ ছিল রাডার প্রযুক্তির উন্নয়নে। তড়িৎচুম্বকীয় প্রযুক্তি খাতে এত বেশি বিনিয়োগ আর কোনোকালেই হয়নি। শুধু বিনিয়োগের দিক থেকেই নয়, রাডার প্রস্তুতের জন্যে এ সময় প্রযুক্তিবিদদের যে দলটিকে একত্রিত করা হয়েছিল তারাও ছিলেন অনন্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিখাতের তারকারা নিজেদের সব কাজ ছেড়ে ছুড়ে এ সময় একত্রিত হয়েছিলেন দেশের প্রতি কর্তব্যের ডাকে। বহু বিনিয়োগকারী ও মেধাবী প্রযুক্তিবিদের সম্মিলনের ফলে সে সময় অসাধারণ সব প্রযুক্তির বীজ বপন হয়েছিল, যা যুদ্ধের বহুদিন পর- এখনো পর্যন্ত সেবা দিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীকে।

রাডারের সাফল্যের পেছনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ছিল ম্যাগনেট্রন নামের একটি ডিভাইস। এটির ফলে খুব সহজে উচ্চ ক্ষমতার মাইক্রোয়েভ উৎপাদন সম্ভব হয়। বেতার তরঙ্গ, আলো ইত্যাদির মতো মাইক্রোওয়েভও একধরনের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। এদের মূল পার্থক্য কেবল কম্পাঙ্কে (বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যে)। রেডিও ওয়েভের তুলনায় মাইক্রোওয়েভের কম্পাঙ্ক বেশি, কিন্তু আলোর চেয়ে কম। আমাদের অতি পরিচিত একটি প্রযুক্তিও এ মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ ব্যবহার করে। সেই 'মাইক্রোওয়েভ ওভেন'-এর গল্প দিয়েই শুরু করা যাক।

ম্যাগনেট্রন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে টেকনিশিয়ানরা লক্ষ্য করেন, ম্যাগনেট্রনের আউটপুট হর্নের সামনে রেখে তারা সিগারেট জ্বালাতে পারেন। কেউ আবার ভেজা কাপড় দ্রুত শোকাতে ম্যাগনেট্রনের মাহাত্ম্য খুঁজে বের করলেন। আরেকজন দেখলেন, ল্যাবে ঢুকতেই তার পকেটে থাকা চকলেট বার গলে একাকার। এসব ঘটনায় মূলত তারা বুঝতে পারলেন যে, মাইক্রোওয়েভ শক্তিকে খুব সহজেই তাপশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব হবে। আর সেখান থেকেই আসে আজকের মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ধারণা।

চিত্র: একটি বাণিজ্যিক ম্যাগনেট্রন ডিভাইস।

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রাডার-পণ্যের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে কমতে থাকে ম্যাগনেট্রনের উৎপাদন খরচ। ম্যাগনেট্রন সস্তা হয়ে উঠায়, মাইক্রোওয়েভ ওভেনের দাম সাধারণ মানুষের নাগালে চলে আসে। এখন তো এটি অনেকের রান্নাঘরের অপরিহার্য অংশ হয়ে গিয়েছে। ম্যাগনেট্রন যে কোনো একদিন রান্নঘরে এর প্রয়োগ খুঁজে পাবে তা হয়তো কখনো ভাবেননি এর উদ্ভাবকেরা। র‍্যানাল্ড ও বুট নামের দুজন প্রযুক্তিবিদ উদ্ভাবন করেছিলেন এটি।

ম্যাগনেট্রনকে একটি বৈদ্যুতিক সকেটের সাথে সংযোগ দিয়ে দিলে এটি বিদ্যুৎ শক্তির প্রায় অর্ধেকই মাইক্রোওয়েভে রূপান্তর করতে পারে। আর পোলারাইজড অণুগুলো মাইক্রোওয়েভ শক্তিকে শোষণ করে একে তাপ-শক্তিতে রূপান্তর করে। যেমন, খাদ্যে থাকা পানির অনুগুলো মাইক্রোয়েভ শোষণ করে তাকে তাপে রূপান্তর করে। এ প্রক্রিয়াটির নাম দেওয়া হয়েছে ডাই-ইলেকট্রিক হিটিং। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্নার জন্য এ প্রক্রিয়াই ব্যবহার করা হয়। এর কল্যাণে শক্তি খরচের দিক থেকে মাইক্রোওয়েভ ওভেন এখন রান্নাঘরে সবচেয়ে কার্যকর প্রযুক্তি।

চিত্র: রান্নাঘরের জনপ্রিয় প্রযুক্তি মাইক্রোওয়েভ ওভেন।

বিশ্বযুদ্ধের সময় রাডার গবেষণার একটি লক্ষ্য ছিল, যতটা সম্ভব ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা। কারণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র হলে এর জন্য প্রয়োজনীয় অ্যান্টেনাও ছোট হয়। ফলে যেসব আকাশযান টার্গেট খুঁজতে রাডার ব্যবহার করে, তারা ছোট অ্যান্টেনা ব্যবহার করেই লক্ষ্যবস্তুর নিখুঁত অবস্থান খুঁজে পেতে পারবে। কিন্তু এটি করতে গিয়ে প্রকৌশলীরা একটি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করেন। তারা দেখলেন, কিছু নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে (বা কম্পাঙ্কে) রাডারের রেঞ্জ অনেক কমে যায়। এ ঘটনার ব্যখ্যা তখন কেউ দিতে পারেনি। আর যুদ্ধের সময় এমন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগও ছিল না তেমন।

যুদ্ধ শেষে প্রফেসররা একাডেমিক গবেষণাগারে ফিরে যাওয়ার পর এসব নিয়ে গবেষণার বিস্তর সুযোগ পান। আবিষ্কৃত হয় যে, নির্দিষ্ট কিছু কম্পাঙ্কে বায়ুমণ্ডলে থাকা বিভিন্ন গ্যাসীয় অণু মাইক্রোওয়েভ শোষণ করে। অর্থাৎ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থগুলো ভিন্ন ভিন্ন কম্পাঙ্কের মাইক্রোওয়েভ শোষণ করে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো প্রত্যেকটি গ্যাসের শোষণ করা তরঙ্গের কম্পাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন। একটি উপাদান যে কম্পাঙ্কের তরঙ্গ শোষণ করে, অন্য উপাদান তা করে না।

এ আবিষ্কারের ফলে জন্ম হয় মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কপি। এটি বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও আবহবিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাইক্রোওয়েভ বর্ণালীবীক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা বায়ুদূষণের মাত্রা, কার্বন নির্গমনের পরিমাণ ইত্যাদি সহ বায়ুমণ্ডলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য জানতে পারেন।

রাডারের পাঠানো তরঙ্গ যখন কোনো একটা চলমান বস্তুর থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, তখন ফিরে আসা তরঙ্গের কম্পাঙ্ক কিছুটা বদলে যায়। পদার্থবিজ্ঞানে এ ঘটনাটি ডপলার শিফট নামে পরিচিত। কম্পাঙ্কের এ ক্ষুদ্র পরিবর্তন থেকে ঐ চলমান বস্তুর দিক ও গতি নির্ধারণ করা যায়। ট্র্যাফিক পুলিশরা এখন এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করেই গাড়ির গতি নির্ধারণ করেন। একই ধরনের প্রযুক্তি বিভিন্ন যানবাহনে বর্তমানে চালকদের সহযোগিতা করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। ড্রাইভারবিহীন স্ব-চালিত স্মার্ট গাড়ি (Self-driving car) উদ্ভাবনের পথও খুলে দিয়েছে এটি।

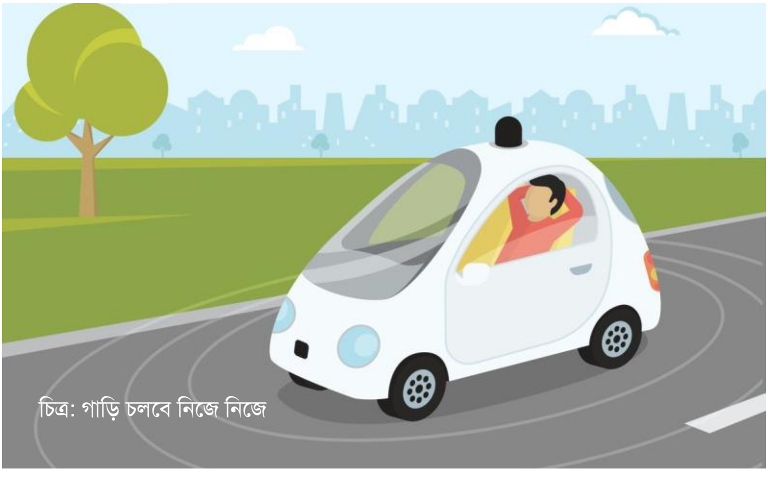

চিত্র: গাড়ি চলবে নিজে নিজে

এ প্রযুক্তিটির আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ আছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে। ডপলার ইফেক্টের সাহায্যে ওয়েদার-রাডারগুলো বিভিন্ন আকার ও ঘনত্বের বৃষ্টির ফোঁটার বণ্টন, গতি ইত্যাদি নির্ধারণ করে। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দিতে এসব রাডারের তৈরি চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিমানে সংযুক্ত রাডারগুলো কয়েক মাইল সামনে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকলে তা জানাতে পারে পাইলটকে, যাতে তিনি যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেন।

রাডার প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা স্রেফ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই বেগবান করেনি, এর পরে সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্র স্নায়ুযুদ্ধের সময় এ প্রযুক্তি আরো বেগবান হয়েছিল। দুটি রাষ্ট্রই হামলার ভয়ে বিশাল পরিসরে রাডার সিস্টেম স্থাপন করেছিল, যাতে কোনো আক্রমণ হলে তারা আগেই জানতে পারে। একই রকম ব্যবস্থা বর্তমানে বিমানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে কাজে দিচ্ছে। সে সময়ে এ ব্যবস্থার উন্নতির ফলেই বর্তমানে প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেকটি আকাশযানকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা সম্ভব হয়।

চিত্র: মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তির রাডারের মাধ্যমে পাওয়া যায় আবহাওয়ার পূর্বাভাষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে অনেক বিজ্ঞানী যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা খাত থেকে অতিরিক্ত রাডার পেয়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ পৃথিবীর সীমা পেরিয়ে মহাকাশের দিকে মুখ ফেরান রাডারের। শুরুটা হয় চাঁদের মাধ্যমে, অধিক শক্তিশালী মাইক্রোয়েভ তরঙ্গ, উচ্চ সংবেদনশীল রিসিভার ও উন্নত সিগন্যাল প্রসেসিং ব্যবহার করে গবেষকরা পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব পরিমাপ করতে সক্ষম হন।

এ কাজ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন মহাকাশের গভীরে কোথাও থেকে যেন খুবই দুর্বল মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ নির্গত হচ্ছে। তারা বুঝতে পারছিলেন, মহাকাশের কোনো বস্তু থেকেই নির্গত হচ্ছে এ তরঙ্গ। এ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দেয় মহাকাশ গবেষণার দুয়ারে। আরো গবেষণার পর একে স্পেকট্রোস্কপির সাথে সমন্বিত করে রেডিও এস্ট্রোনোমি নামের নতুন সে সম্ভাবনার দুয়ার খোলেন বিজ্ঞানীরা।

কোনো বস্তু থেকে তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ নির্গত হওয়ার ধারণাটি প্রথম জানা যায় ম্যাক্স প্লাঙ্কের কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ তত্ত্ব থেকে। এ অনুসারে পরম শূণ্য তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় সব বস্তুই বিভিন্ন কম্পাঙ্কের তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ বিকিরণ করে। মহাকাশের খুবই কম তাপমাত্রায় অধিকাংশ বস্তু যে তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ বিকিরণ করে, তা মাইক্রোওয়েভের সীমার মধ্যে পড়ে। ফলে মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম ব্যবহার করে রেডিও এস্ট্রোনোমি মহাকাশ গবেষণাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

চিত্র: উন্মোচিত হয় রেডিও এস্ট্রোনমি নামে গবেষণার নতুন এক দুয়ার।

রেডিও এস্ট্রোনমির কল্যাণে মানবজাতি অসাধারণ সব বিষয়ে নতুন সব ধারণা লাভ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো, বিগ ব্যাং থিওরি যা মহাবিশ্বের জন্ম নিয়ে আলোচনা করে। সাফল্যের ফলে রেডিও এস্ট্রনোমাররা উৎসাহিত হন মাইক্রোওয়েভ রিসিভারের সংবেদনশীলতা আরো বৃদ্ধির চেষ্টা করতে, যাতে মহাকাশ থেকে আসা ক্ষীণ কোনো সংকেতও আমাদের নজর না এড়ায়। এর ফলে গ্রহ, নক্ষত্র, মহাকাশীয় ধূলা ইত্যাদিকে আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয় মানুষ। আরো ভালোভাবে বুঝতে পারে এ সুবিশাল মহাবিশ্বের বৈচিত্রকে।

তবে অবাক করার মতো বিষয় হচ্ছে, এই যে এ অসাধারণ সব প্রযুক্তিগুলো আমাদের জীবনকে সহজ করে দিচ্ছে, সমৃদ্ধ করছে বিজ্ঞানকে এ মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জানাচ্ছে অসাধারণ সব তথ্য, এসবের জন্যে আমরা কিন্তু অনেকটাই ঋণী ভয়াবহ একটি বিশ্বযুদ্ধের কাছে।

তথ্যসূত্র: Conquering the Electron by Derek Cheung, Eric Brach.

Visit us- z2i.org

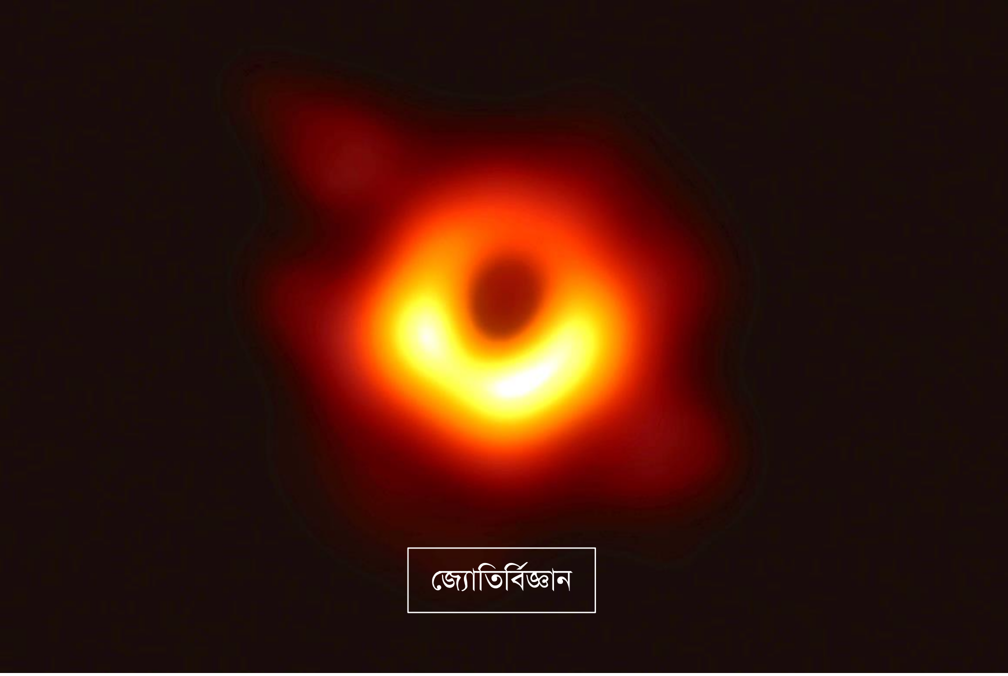

কৃষ্ণগহ্বরের প্রথম ছবি: অদেখাকে দেখল মানুষ

ফরহাদ হোসেন মাসুম
পিএইচডি গবেষক, ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়া
facebook.com/farhad.masum

২০১৯ সালের এপ্রিলের ১০ তারিখে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের প্রেস কনফারেন্সে একটা অস্পষ্ট ছবি প্রকাশ করা হলো। সেই ছবিতে কোনো সুপারমডেল নেই; নেই নীল সমুদ্র, সোনালি সূর্য, রূপালি চাঁদ, অথবা সবুজ গাছপালার মতো কিছু। তবু গোটা দুনিয়া জুড়ে সেদিন সবাই এটা নিয়েই কথা বললো। অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটারস নামক বিজ্ঞান সাময়িকীতে ছাপা হওয়া এই ছবিটা রাতারাতি সুপারস্টার হয়ে গেল। আর হবারই কথা। গত কয়েক দশক ধরে আমরা যে জিনিসটাকে শুধু শিল্পীর কল্পনায় আঁকা ছবিতে দেখেছি, সেই জিনিসটার সত্যিকারের ছবি দেখতে পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? যে জিনিসের গায়ে আলো পড়লে প্রতিফলিত হয় না, সোজা কথায় যাকে দেখা যায় না, সেই জিনিসের ছবি তো ডুমুরের ফুলই! তাই, প্রথমবারের মত ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বরের ছবি প্রকাশিত হলো, তখন একটু হৈ হল্লা তো হবেই!

মজার কথা হচ্ছে, এখনো কিন্তু আসলে আমরা কৃষ্ণগহ্বরকে দেখতে পাচ্ছি না। কারণ, সেটা তো অসম্ভব। পদার্থবিদ্যার সূত্রকে ভেঙে কিছুই করা যায় না, আলো প্রতিফলিত না করলে কিছুই দেখা যাবে না। উপরের ছবিতে মাঝখানে কালো অংশের মধ্যে যেটাকে

দেখা যাচ্ছে না, সেখানেই আছে কৃষ্ণগহ্বরটা। আর তার চারপাশে তাহলে কী দেখা যাচ্ছে? একদিকে মোটা, আরেকদিকে চিকন কেন? এই ছবি নিয়ে এত মাতামাতি করার কী আছে? আজকে আমরা সেই জিনিসগুলোই একটু সহজে আলোচনা করার চেষ্টা করব। তবে তার আগে কৃষ্ণগহ্বর কী, এটা কীভাবে তৈরি হয়, এটার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী, সেটা নিয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে একটু আলাপ করার প্রয়োজন আছে। এর পরেই আবার ছবিটার আলোচনায় ফেরত আসবো।

কৃষ্ণগহ্বর কী?

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, কৃষ্ণগহ্বর হচ্ছে একটি মৃত নক্ষত্র। এর ভর আর ঘনত্ব এত বেশি যে এর একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে চলে আসলে এর মহাকর্ষের বন্ধন ছিন্ন করে কিছুই বেরিয়ে যেতে পারে না। এমনকি সবচেয়ে দ্রুতগামী এবং ভরহীন আলোও না। *যে জিনিসের ভর যত বেশি, তার মহাকর্ষ বল তত বেশি শক্তিশালী। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাধারণ আপেক্ষিকতা অনুসারে মহাকর্ষ কোনো আকর্ষণ বল নয়। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ।* প্রায় সকল ছায়াপথের কেন্দ্রেই বড় আকৃতির কৃষ্ণগহ্বর থাকে। এগুলোকে বলে সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল।

প্রত্যেকটা জিনিসই স্থান-কালের চাদরে একটা বক্রতা তৈরি করে; আর এই বক্রতাকেই আমরা মহাকর্ষ বলি। যে জিনিসের ভর যত বেশি, সেটা তত বেশি বক্রতা তৈরি করে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। আর এই বক্রতার জন্যেই আশেপাশের অপেক্ষাকৃত কম ভরের বস্তুগুলো মূল বস্তুটাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে বলে মনে হয়। যেমন, সূর্যের চারপাশে আমাদের পৃথিবী। আর কৃষ্ণগহ্বরের বক্রতা এত বেশি যে এটার কেন্দ্রে একটা অনন্য অবস্থা তৈরি হয়, অদ্ভুত সব খেল চলতে থাকে এখানে। এটাকে আমরা বাংলায় বলি অনন্যতা, ইংরেজিতে বলি সিঙ্গুলারিটি।

আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, এই সিঙ্গুলারিটিতে বস্তুর ঘনত্ব অসীম, কারণ অতি ক্ষুদ্র জায়গায়, একটি বিন্দুর মধ্যে, অতি বিশাল পরিমাণের বস্তু জায়গা করে নেয়। আর এর মহাকর্ষ এত বেশি হয় যে সময়কেও থমকে দাঁড়াতে হয়। স্থান যেমন বেঁকে যায়, কালও বেঁকে যায় এবং ধীরে চলে।

চিত্র: নক্ষত্রের ভর যত বেশি হবে
তার বক্রতা তত বেশি হবে।

কৃষ্ণহ্বরের অনন্যতাকে কেন্দ্র করে যে এলাকার মধ্যে ঢুকলে আর কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না, সেই এলাকাকে বলে ঘটনা দিগন্ত বা ইভেন্ট হরাইজন। সহজ করে এর

একাডেমিক সংজ্ঞা হচ্ছে, যে এলাকার বাইরে থাকলে ভেতরের ঘটনাবলী আপনার কাছে আসতে পারবে না। যেমন, ঘটনা দিগন্তের ভেতর থেকে কোনো আলো রওনা দিলে সেই জিনিস আপনার চোখ পর্যন্ত পৌঁছাবে না। এই জিনিসের নামেই টেলিস্কোপটার নাম রাখা হয়েছে এবং টেলিস্কোপের উদ্দেশ্য নাম থেকেই পরিষ্কার।

কৃষ্ণগহ্বরের বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে একটা জিনিস সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা খুব জরুরী, শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ। শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ বের করার সমীকরণটা আগে দেখি, তারপর ব্যাখ্যা করছি কীভাবে এটা কৃষ্ণগহ্বরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমীকরণটা হচ্ছে।

Schwarzschild Radius, $SR = \frac{2GM}{C^2}$

এখানে G হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, M হচ্ছে বস্তুর ভর, আর C হচ্ছে আলোর গতি। যে বস্তুর ব্যাসার্ধ শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধের চেয়ে কম, সেটাই কৃষ্ণগহ্বর। সিঙ্গুলারিটির বা কেন্দ্র থেকে এক শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ ধরে যে গোলক হয়, সেটাই ঘটনা দিগন্ত।

কৃষ্ণগহ্বর যদি স্থির থাকে, তাহলে তিন শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধের কাছাকাছি এলাকাতে একটা কক্ষপথ তৈরি হয়। সেখান থেকে শুরু করে আরো কিছু দূর পর্যন্ত এলাকা জুড়ে গ্যাস, ধূলা, আর আলোর কণার একটা চাকতির মতো অবস্থা তৈরি হয়। সেটাকে বলে অ্যাক্রিশন ডিস্ক (Accretion Disk)। বাংলায় এটার নাম দেওয়া যেতে পারে পরিবর্ধিত চাকতি।

এই চাকতি থেকে ভেতরে গেলেই কৃষ্ণগহ্বরের ভয়ানক মহাকর্ষ তাকে অত্যন্ত দ্রুত ঘটনা দিগন্তের ভেতরে টেনে নেয়। ঘূর্ণনরত কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে হিসেবগুলো একটু ভিন্ন, তবে ব্যাপারটা একই। এই জায়গাটা প্রচণ্ড গতিতে কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। এবং এটা খুবই উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে।

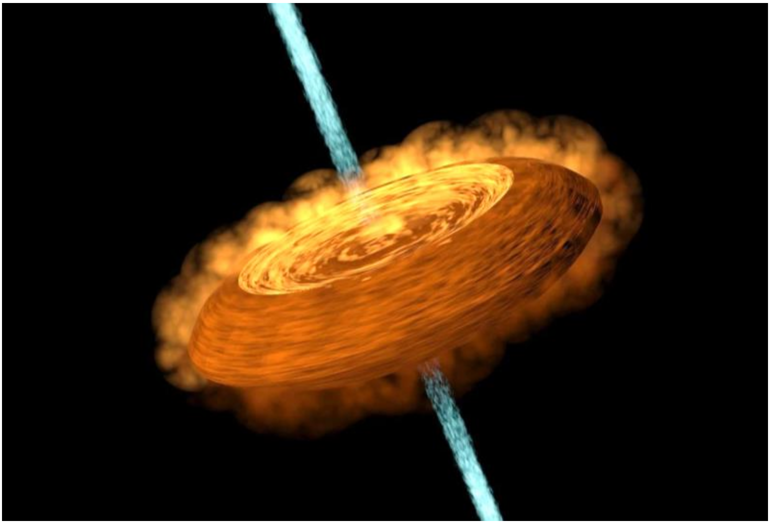

চিত্র: গ্যাস, ধূলা, আর আলোর কণার ঘূর্ণনে তৈরি হয় অ্যাক্রিশন ডিস্ক।

কীভাবে তৈরি হয় কৃষ্ণগহ্বর?

মানুষের যেমন জন্ম-মৃত্যু আছে, নক্ষত্রেরও আছে। নক্ষত্র তৈরি হয় নীহারিকা বা নেবুলাতে অবস্থিত গ্যাস থেকে। গ্যাস বলতে মূলত হাইড্রোজেন বোঝাচ্ছি, এটাই ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে সরল এবং সবচেয়ে সহজলভ্য গ্যাস। হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোর সংখ্যা এত বেশি হয়ে যায় যে তাদের মধ্যকার মহাকর্ষ বাড়তে বাড়তে প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে যায়। একসময় চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু নিউক্লীয়ভাবে আবদ্ধ হয়ে দুটি হিলিয়াম অণুতে পরিণত হয়, এই পদ্ধতিকে ফিউশন বলে। তখন ঘটে বিস্ফোরণ, ছড়িয়ে পড়ে তাপ আর আলো। প্রতি সেকেন্ডে অসংখ্য বিস্ফোরণ হতে থাকা এই আলো আর তাপের গোলককে আমরা নক্ষত্র বলি।

মহাকর্ষ কিন্তু নক্ষত্রের অণু-পরমাণুগুলোর মধ্যে ঠিকই কাজ করছে। কিন্তু ক্রমাগত এই বিস্ফোরণ চলছে বলেই নক্ষত্রগুলো আরো সংকুচিত হতে পারছে না। কিন্তু একসময় প্রত্যেকটা নক্ষত্রের জ্বালানি ফুরিয়ে যায়। অন্তত এতটা কমে যায় যে, আগের মতো বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে না। তখন মহাকর্ষের শক্তিটা আবার প্রকাশিত হয়, নক্ষত্র সংকুচিত হতে থাকে, তার মৃত্যু ঘটতে থাকে।

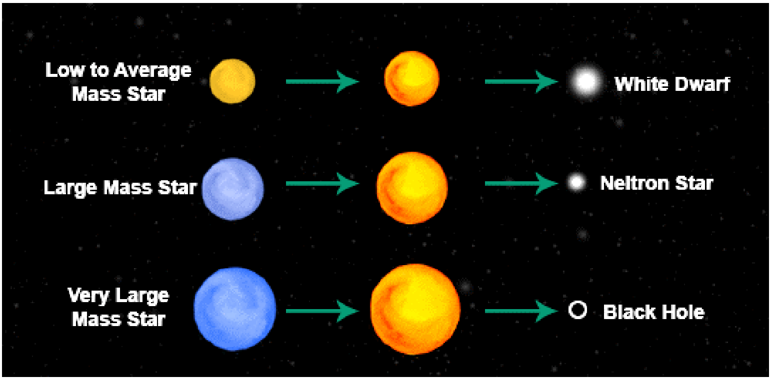

চিত্র: নক্ষত্রের তিন ধরনের মৃত্যু।

এই মৃত্যু তিনভাবে ঘটতে পারে। এটা নিয়ে কার্ল সেগান তার টিভি সিরিজ *কসমস*-এ এত সুন্দর করে বলেছেন যে এখানে আর কষ্ট করে ভেবে ভেবে কিছু লিখতে হবে না। তার কথাগুলোই অনুবাদ করে দিচ্ছি-

"তিনভাবে নক্ষত্রের মৃত্যু হতে পারে। তাদের নিয়তি আগেই লেখা হয়ে যায়। পুরোটাই নির্ভর করে নক্ষত্রের প্রাথমিক ভরের ওপর। সাধারণ নক্ষত্র, যাদের ভর আমাদের চির পরিচিত সূর্যের মতো, তাদের ধসে পড়া চলতে থাকবে, যতক্ষণ না উচ্চ ঘনত্ব অর্জন করছে। এরপর সংকোচন থেমে যাবে, কারণ কেন্দ্রে ভিড় করা ইলেকট্রনগুলো পরস্পরকে বিকর্ষণ করতে থাকবে। ধ্বসে পড়তে থাকা নক্ষত্র যদি সূর্যের দ্বিগুণ হয়, সেটা ইলেকট্রনের বিকর্ষণে থামে না। এটা সংকুচিত হতেই থাকে, যতক্ষণ না নিউক্লীয় শক্তি মাঠে নামে এবং সেটাই নক্ষত্রকে টিকিয়ে রাখে। কিন্তু ধসে পড়তে থাকা নক্ষত্রটা সূর্যের ৩ গুণ হলে, নিউক্লীয় বলেও থামে না। এমন কোনো শক্তিই নেই যা দিয়ে এই ভয়াবহ চাপকে বাধা

দিতে পারবে। আর এধরনের নক্ষত্রের রয়েছে এক অভাবনীয় নিয়তি। এর সংকোচন চলতে থাকে, আর একসময় পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়।

নক্ষত্রের শ্রেণীবিভাগ করা যায় মহাকর্ষের বিরুদ্ধে কার্যরত বল দিয়ে। যে নক্ষত্র গ্যাসের চাপে টিকে আছে, সেটা স্বাভাবিক, গড়পড়তা নক্ষত্র, যেমন আমাদের সূর্য। ইলেকট্রনের বিকর্ষণে টিকে থাকা নক্ষত্রকে বলে– সাদা বামন (White Dwarf)। এমন হলে সূর্যের আকার হয়ে যায় পৃথিবীর মতো। নিউক্লীয় বল দ্বারা টিকে থাকা নক্ষত্রকে বলে– নিউট্রন নক্ষত্র (Neutron Star)। এমন হলে সূর্যের আকার হবে একটা শহরের মতো। আর নক্ষত্র যদি এতো বড় হয় যে ধ্বসের পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সেটাকে বলে কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole)।"

কী দেখলাম আমরা প্রথম ছবিতে? আসুন, ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপে তোলা কৃষ্ণগহ্বরের প্রথম ছবিটা আরেকবার দেখি।

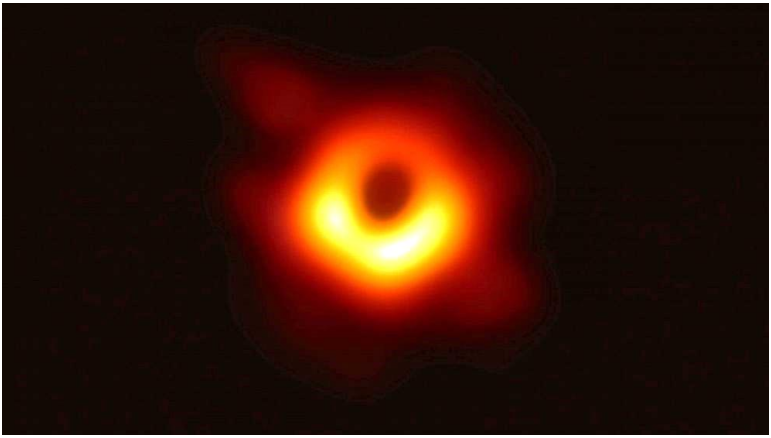

এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে মেসিয়ার ৮৭ বা M87 নামক ছায়াপথের কেন্দ্রে থাকা কৃষ্ণগহ্বরটিকে। এটার ভর সাড়ে তিন থেকে সাড়ে ছয় বিলিয়ন সূর্যের সমান। ছবিতে আরো দেখা যাচ্ছে মাঝের ঘটনা দিগন্ত এবং আয়নিত গ্যাসের পরিবর্ধিত চাকতি। চাকতিটির গতি সেকেন্ডে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার, আর ব্যাস প্রায় ০.৩৯ আলোকবর্ষ! এক আলোকবর্ষ মানে হচ্ছে আলো এক বছরে যতদূর যায়। আর এই ছায়াপথটি আমাদের কাছ থেকে প্রায় ৫৩ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। ঠিক এখন যে ছবিটা আমরা দেখছি, এটা ঐ কৃষ্ণগহ্বরের ৫৩ মিলিয়ন বছর আগের ঘটনা। তখন পৃথিবীর অবস্থা কী ছিল?

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, *"আরে, আমাদের ছায়াপথেও না একটা কৃষ্ণগহ্বর আছে? ওটার ছবি না তুলে ৫৩ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের ছবি তুললো কেন?"* জ্বি হ্যাঁ, আমাদের ছায়াপথের মাঝেও একটা বড়সড় কৃষ্ণগহ্বর আছে, ওটার নাম স্যাজিটারিয়াস এ। ওটা M87 এর চেয়ে অনেক কাছে, কথা সত্য। কিন্তু ওটা আর আমাদের মাঝখানে আরো অনেক বাধা-বিপত্তি (পড়ুন গ্রহ-নক্ষত্র এবং আরো অন্যান্য যা যা ছায়াপথে থাকে আর কি, সবই) আছে।

ছবিতে নিচের দিকে আলোটাকে বেশি উজ্জ্বল মনে হচ্ছে কারণ ওটা আমাদের (মানে, পৃথিবীর) দিকে আসছে। অপরদিকের আলোর ঔজ্জ্বল্য একটু কম, কারণ ওটা আমাদের দিক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাছে আসা ও দূরে সরে যাবার কারণে উজ্জ্বলতার হেরফের হবার ঘটনাটি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মেই ঘটে। এই ঘটনার নাম ডপলার কিরণ বা আপেক্ষিক কিরণ [এখানে beaming এর বাংলা বোঝাতে কিরণ ব্যবহার করা হয়েছে]। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই ছায়াপথ এবং এই কৃষ্ণগহ্বর আমাদের মাথার প্রায় বরাবর উপরের দিকে। এবং সত্যিই তাই! উত্তর আকাশের Virgo ছায়াপথগুচ্ছের একটি এই M87।

কীভাবে তোলা হয়েছে এই ছবি?

পৃথিবীর আটটা জায়গাতে বিশেষ ধরনের টেলিস্কোপ (ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ) বসিয়ে এই যজ্ঞ সাধন করা হয়েছে। এই টেলিস্কোপগুলো বেতার ঔজ্জ্বল্য (Radio brightness)-এর fourier components (সহজ ইংরেজিতে visibility) পরিমাপ করে। এই টেলিস্কোপগুলো মিলিয়ে একটা বিশাল টেলিস্কোপ বানানো হয়েছে।

এদের থেকে পাওয়া উপাত্তগুলো প্রত্যেকটা সেন্টারে আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে সবাই শেষ পর্যন্ত একই ছবি পায়। একজন একরকম পেলো, আরেকজন অন্যরকম পেলো– এরকম হলে ধরে নেওয়া হতো যে গবেষণায় কোনো না কোনো ভুল হয়েছে। কিন্তু সবাই একই চিত্র পাওয়ায় সন্দেহের অবকাশ রইলো না।

চিত্র: পৃথিবীর আটটি স্থানে স্থাপিত আটটি টেলিস্কোপ নিয়ে গঠিত ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ।

প্রশ্ন হতে পারে, *“এত বড় আর এতগুলো টেলিস্কোপ দিয়ে কী লাভ হলো? ছবিটা এত ঘোলা কেন? ইন্টারস্টেলার চলচ্চিত্রে তো কী সুন্দর ব্ল্যাক হোল দেখলাম!”* তাহলে আবার পড়ুন, ৫৩ মিলিয়ন আলোকবর্ষ! এটা এতই দূরে যে, এক দুই তিন কিলোমিটার করে গুনতে থাকলে সারা জীবন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু গোনা শেষ হবে না।

তবে হ্যাঁ, ধীরে ধীরে আমাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্র আরো শক্তিশালী হবে। তখন আমরা কৃষ্ণগহ্বরের আরো ভালো ছবি পাবো। বিজ্ঞান এগিয়ে চলবেই।

পরিশেষে

কেন এই ছবিটা অত্যন্ত জরুরি বা কেন এটা নিয়ে মাতামাতি হচ্ছে, সেটার প্রধান কারণ হচ্ছে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের অন্যতম একটা ভবিষ্যদ্বাণী ছিল কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব। আইনস্টাইনের ১৯১৫ সালের প্রবন্ধেই এমন কিছুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছিল।সাধারণ আপেক্ষিকতা থেকে ব্ল্যাক হোলের তাত্ত্বিক সম্ভাবনা প্রথম দেখেন শোয়ার্জশিল্ড। উনিই প্রথম এই ব্যাপারে গবেষণাপত্র লিখেন। আইনস্টাইন সেই গবেষণাপত্রের হিসেব ঠিক আছে বলে স্বীকার করলেও কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে অস্বস্তি বোধ করতেন। তার মৃত্যুর পর স্টিফেন হকিংয়ের মতো বিজ্ঞানীদের হাত ধরে আমরা এ ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

এরপর অন্যান্য নক্ষত্রের গতিবিধি (তারা অদৃশ্য কিছু একটাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, সেটা) থেকে কৃষ্ণগহ্বরের প্রভাব দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এরকম পরিবর্ধিত চাকতি সহ ঘটনা দিগন্তের কোনো ছবি আমরা তুলতে পারিনি এতদিন। সাধারণ আপেক্ষিকতার পক্ষে এটা একটা বিশাল প্রমাণ। এটার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের জায়গাটা হচ্ছে– কৃষ্ণগহ্বরের বিস্তারিত গবেষণা আমাদেরকে এই মহাবিশ্বের উৎপত্তির ব্যাপারে অনেক নতুন তথ্য দিতে পারে। তাই, কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে যেকোনো ধরনের নতুন আবিষ্কার বিজ্ঞানীদেরকে আনন্দে উদ্বেলিত করে।

চিত্র: দেখে যেতে পারেননি আইনস্টাইন ও হকিং

একদিকে আমি যেমন অত্যন্ত আনন্দিত, অন্যদিকে এটা ভেবে কষ্টও লাগছে যে এই ছবিটা দেখার জন্য আইনস্টাইন বা স্টিফেন হকিং বেঁচে নেই। তারা যে কী খুশি হতেন মানবজাতির এই সাফল্য দেখে! আইনস্টাইন সেই কবে বলে গিয়েছিলেন এমন কিছু আছে! হকিংয়ের তো সারা জীবনই কেটেছে এই জিনিস নিয়ে গবেষণা করে। কৃষ্ণগহ্বরের যে এনট্রপি আছে, এখান থেকে যে তথ্য বিকিরিত হয় (হকিং রেডিয়েশন), সেই প্যারাডক্স (ব্ল্যাক হোল ইনফরমেশন প্যারাডক্স)– সবই তার গবেষণার ফসল।

কৃতজ্ঞতা: বিজ্ঞানযাত্রা (www.bigganjatra.org)

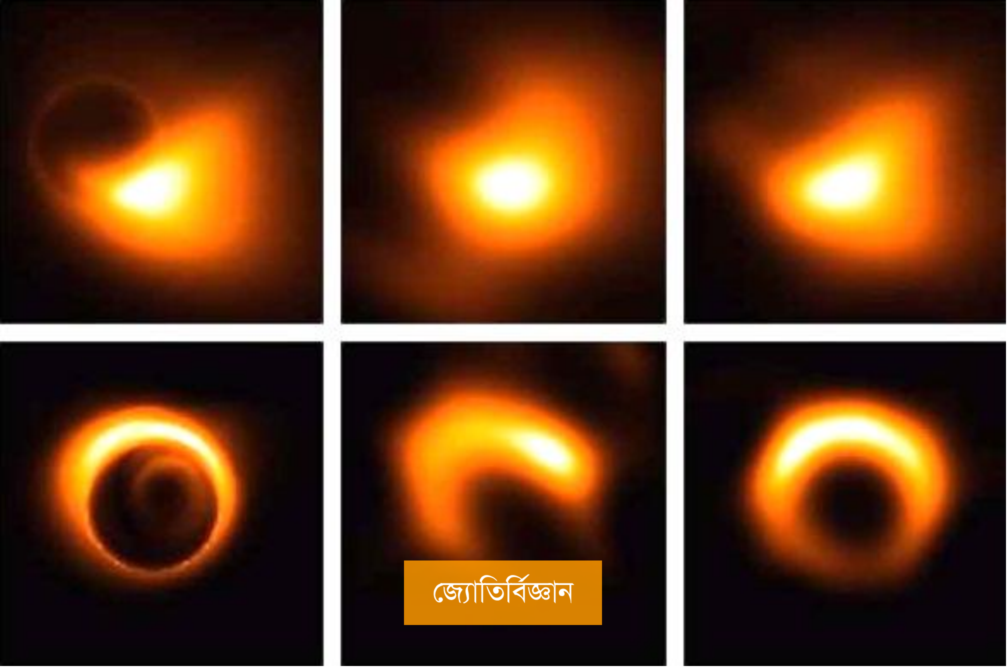

ব্ল্যাকহোলের প্রথম ছবি কি আসলেই 'ছবি'?

এ.এস.এম ফখরুল ইসলাম
নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যারোলিনা
facebook.com/asmfakhrul

মহাবিশ্বের এক অপার রহস্যের নাম ব্ল্যাক হোল। এর আকর্ষণ ক্ষমতা এতই বেশি যে এর আশেপাশের সকল কিছু এমনকি আলোকেও নিজের দিকে টেনে ধরে রাখে। আলো আসতে পারে না বলে একে দেখা অনেকটা অসম্ভবই বলা চলে। এর অস্বিত্ব ও প্রভাব নিয়ে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ দিন ধরে তাত্ত্বিক আলোচনা করে আসলেও এর সত্যিকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে কারো কোনো ধারণা ছিল না।

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলেছে ব্ল্যাকহোলের প্রথম ছবি। তার মানে বাস্তবে প্রমাণিত হলো ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব আছে। এদের অস্তিত্ব পরীক্ষামূলকভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এমনটা হয়তো বিজ্ঞানীরাও ভাবেননি। খোদ আইনস্টাইন, যার আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে ব্ল্যাক হোল ধারণার উৎপত্তি, তিনিই বলেছিলেন তিনি মনে করেন তাত্ত্বিকভাবে ব্ল্যাক হোলের অস্বিত্ব সম্ভব হলেও বাস্তবিক অর্থে এর কোনো অস্বিত্ব নেই। আইনস্টাইনের বিশ্বাস প্রমাণিত না হলেও এক্ষেত্রে নিজের তত্ত্বকে অবিশ্বাস করে তিনি ভুল করেছেন। বিজ্ঞানীরা মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ব্ল্যাক হোলের ছবি তুলে প্রমাণ করে দিয়েছেন আইনস্টাইনের ধারণা ভুল, কিন্তু তাঁর তত্ত্ব সঠিক!

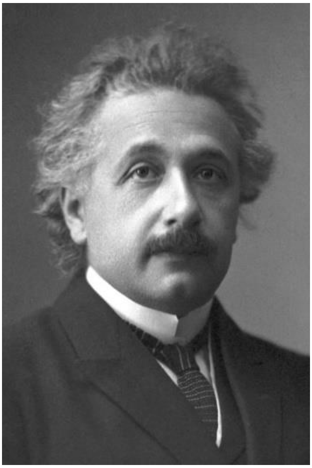

চিত্র: অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

মোটামুটি প্রতিটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে এক বা একাধিক ব্ল্যাক হোল আছে। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রেও আছে একটি ব্ল্যাক হোল। এর নাম 'স্যাজিটেরিয়াস-এ'। পৃথিবী থেকে এ ব্ল্যাকহোলের দূরত্ব ২৬ হাজার আলোকবর্ষ। অথচ যে ব্ল্যাকহোলের ছবি বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি তুলেছে সেটির অবস্থান ৫৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। তাহলে কাছের ব্ল্যাকহোল রেখে এত দূরের ব্ল্যাকহোলের ছবি তোলার জন্য কেন এত বড় আয়োজন?

যে ব্ল্যাকহোলটির ছবি বিজ্ঞানীরা তুলেছেন, সেটির অবস্থান পৃথিবী থেকে অনেক দূরে হবার পাশাপাশি এর আকারও সুবিশাল। আকারে এটি প্রায় আমাদের সৌরজগতের সমান। সে তুলনায় আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থিত ব্ল্যাকহোলটির আকার নিতান্তই ছোট। প্রায় ২০০০ ভাগের এক ভাগ। দূরত্ব ও আকারের এই তারতম্যের কারণে আমাদের দৃষ্টিতে ব্ল্যাক হোল দুটো শেষমেষ আকারে প্রায় সমান হয়ে ধরা দেয় (দৃষ্টিকোণের কারণে)।

তার উপর আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা ব্ল্যাক হোলের তুলনায় ৫৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের M87 ব্ল্যাক হোলটি অনেক বেশি সক্রিয়। আমাদের দৃষ্টিতে M87 ও স্যাজিটারিয়াস-এ ব্ল্যাকহোল দুটি আকারে সমান হয়ে ধরা দিলেও প্রকৃতপক্ষে M87 ব্ল্যাকহোলটি আকারে অনেক অনেক বড় হওয়ায় ছবি তোলার ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা ছিল। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিক থেকে M87 ব্ল্যাক হোলটির অবস্থান পৃথিবীতে অবস্থিত দূরবীনগুলোর জন্য সুবিধাজনক হওয়ায় ছবি তোলার জন্য বিজ্ঞানীরা সেটিকেই লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেন।

চিত্র: শিল্পীর কল্পনায় ব্ল্যাক হোল

কিন্তু ব্ল্যাকহোলের প্রথম ছবি বলে যে সারা বিশ্ব এভাবে উদ্বেলিত, আসলেই কি সেটি ব্ল্যাকহোলের ছবি? আমরা কি ব্ল্যাকহোলের উপর ক্যামেরা ফোকাস করে ক্লিকের মাধ্যমে ছবিটি তুলেছি? মূলত ছবি বলতে আমরা যা বুঝে থাকি, ব্ল্যাকহোলের ছবিটি প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বরং অসংখ্য তথ্যের সমন্বয়ে গড়া রিকন্সট্রাকশান ফিগার। মহাশূন্যের যেসব ছবি আমরা দেখি তাদের বেশিরভাগই সাধারণ ক্যামেরায় তোলা ছবি না। বরং রিকন্সট্রাকশান। ছবি হিসেবে আমরা যা দেখি এগুলো আসলে তথ্য। তথ্য থেকে বিজ্ঞানীরা ছবি তৈরি করে আমাদের দেখান।

মনে করুন, আপনি একটি ভীড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন। ভীড়ের কারণে আপনি আপনার সামনের সর্বোচ্চ কয়েকজন মানুষের চেহারা দেখতে পাবেন। আপনার সামনের কয়েকজনের পর বাকিদের চেহারা কিন্তু আপনি ভীড়ের কারণে দেখতে পাবেন না। কিন্তু আপনার কাছে যদি এমন কোনো প্রযুক্তি থাকে যার দ্বারা আপনি আপনার সামনের মানুষদের ভেদ করে তাদের পেছনে কি আছে সেগুলো দেখতে পাবেন, কেবল তখনই আপনার পক্ষে আপনার সামনে থাকা বাধার পেছনের জিনিসগুলো দেখা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই মহাবিশ্বের দূর-দূরান্তের ছবি সাধারণ মানুষের সামনে তাদের বোধগম্য উপায়ে উপস্থাপন করে থাকেন। তাই এই ছবিগুলোকে আমাদের নিত্য বাস্তব অভিজ্ঞতার অর্থে ছবি বলা যায় না।

চিত্র: বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির বিভিন্ন রিকন্সট্রাকশান

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে করুন, আপনি মাটিতে একজন ব্যক্তির ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। সেই ছায়ার আকৃতি কাগজে এঁকে আপনি দাবি করলেন যে এটি সেই ব্যক্তির দেহাবয়ব। কিন্তু আপনি তো সেই বক্তিকে কখনো দেখেননি। কিন্তু এটাও তো সত্যি যে সেই ব্যক্তিকে কেউ সরাসরি দেখতে পেলে তিনি আবিষ্কার করবেন, আপনি ছবিতে যেমন দেহাবয়ব দেখিয়েছেন সে ব্যক্তির দেয়াবয়ব আসলেই তেমন। ছায়া দেখে আঁকা আপনার ছবিটি তাই একধরনের রিকন্সট্রাকশান।

মহাবিশ্বের গ্যাস, ধূলাবালি ইত্যাদির কারণে বহু দূরের নক্ষত্র আমাদের ক্যামেরা ভালোভাবে দেখতে পায় না। এ সমস্যা সমাধানের জন্যে বিজ্ঞানীরা বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ব্যবহার করে ছবি তুলে থাকে। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এ অংশগুলো রেডিও ওয়েভ বা ইনফ্রারেড হয়ে থাকে। যেসব ক্যামেরা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ইনফ্রারেড অংশকে ব্যবহার করে ছবি তোলে তাদের বলা হয় ইনফ্রারেড ক্যামেরা। মহাবিশ্বের যে ছবিগুলো আমরা দেখি তার অনেকগুলোই এ ধরনের ক্যামেরায় তোলা। সম্প্রতি যে ব্ল্যাকহোলটির ছবি প্রকাশ করা হয়েছে এটির নাম M87। যে ক্যামেরার ব্যবহার করে এই ব্ল্যাকহোলের ছবি তোলা হয়েছে এটির নাম ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ, যা রেডিও ওয়েভ ও ইনফ্রারেড তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যবহারে ছবি তুলেছে।

চিত্র: সকলের কাছে উন্মোচন করা হচ্ছে ব্ল্যাক হোলের প্রথম ছবি।

পৃথিবী থেকে ৫৫ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরের এই ব্ল্যাকহোলের ছবি তোলা পৃথিবী থেকে চাঁদের উপর রাখা কমলার ছবি তোলার মতো। কিন্তু এত দূর থেকে ছবি তুলতে যে আকারের দূরবীণ দরকার সে আকারের দূরবীণ বানানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সে রকম একটি দূরবীণের আকার হবে পৃথিবীর সমান!

এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত ৮টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীণ ব্যবহার করেছেন। দূরবীণগুলো স্থাপন করা হয়েছে এমন জায়গায় যেখানে রাতের আঁধারে লোকালয়ের আলো পৌঁছে না। ফলশ্রুতিতে, মানবসৃষ্ট শহরের কৃত্রিম আলো বিজ্ঞানীদের ছবি তোলার পথে অন্তরায় হতে পারেনি। দূরবীণগুলো স্থাপন করা হয়েছে এমন সব জায়গায়, যেমন পাহাড়ের অনেক উঁচুতে, যেখানে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতি খুব কম। ফলশ্রুতিতে, বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প বহুদূরের দৃশ্য দেখার ক্ষেত্রে বড় ধরনের অন্তরায় হতে পারেনি।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা এই ৮টি টেলিস্কোপ থেকে রেডিও তরঙ্গদৈর্ঘ্যে নিখুঁতভাবে একই সময়ে তোলা ছবিগুলো একসাথে করে ব্ল্যাকহোলের চূড়ান্ত একটি ছবি দাঁড় করানো হয়। এক্ষেত্রে পৃথিবীর ঘূর্ণন ছবির উচ্চ রেজ্যুলেশন পেতে সহায়তা করেছে।

কারণ দূরবীণগুলো নিজেদের অবস্থানে স্থির থাকলেও পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে, মহাবিশ্বের সাপেক্ষে, ১২ ঘণ্টায় পৃথিবীর ব্যাসের সমান দূরত্ব ভ্রমণ করেছে।

পৃথিবীর সাথে ঘুরতে ঘুরতে তারা যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেই পুরো পথে ছবি তুলতে থাকার ফলে শেষ পর্যন্ত এই ৮টি দূরবীণ মিলে পৃথিবীর সমান একটি ভার্চুয়াল দূরবীণের সৃষ্টি করেছে, ফলে ছবিগুলোর রেজুলেশন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ছবিগুলো যেহেতু কনভেনশনাল ক্যামেরায় এক ক্লিকে তোলা কোনো ছবি নয়, বরং দীর্ঘ সময় ধরে সংগ্রহ করা অসংখ্য তথ্যের সমন্বয়ে গড়া রিকন্সট্রাকশন, তাই ব্ল্যাক হোলের যে ছবিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটি আসলে আমরা ছবি বলতে যা বুঝি ঠিক তা নয়। তবে ব্ল্যাক হোলটির সত্যিকারের চিত্র বোঝার জন্য এটি পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট।

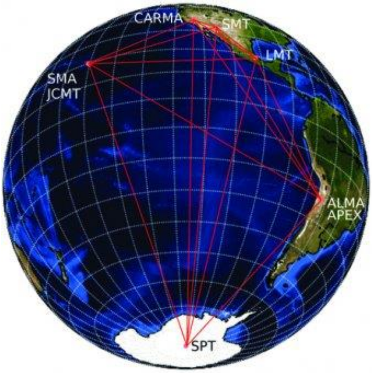

(a) The EHT at a snapshot in time as seen by Sgr A*.

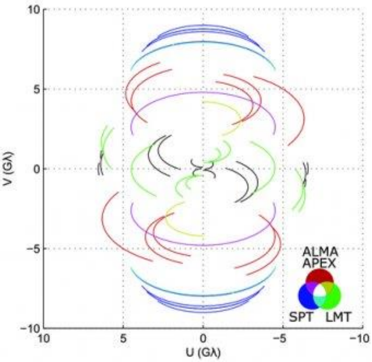

(b) Visibility coverage of the EHT with reference to Sgr A* computed for 1.3 mm.

চিত্র: পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ৮টি টেলিস্কোপের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে একটি বড় ভার্চুয়াল টেলিস্কোপ। টেলিস্কোপটির নাম ইভেন্ট হরাইজন।

মহাবিশ্বের ধুলো, গ্যাসের বাধা পেরিয়ে বহুদূরের ব্ল্যাকহোলের ছবি তোলার জন্য বিজ্ঞানীরা পরোক্ষ পদ্ধতির সহায়তা নিলেও যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি ব্ল্যাকহোলটির নির্ভরযোগ্য ছবি। ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবি বলতে আমরা যা বুঝি এটি হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু মানবজাতির সীমাহীন আগ্রহের খোরাক মেটানোর পথে এই ছবি বিশাল এক অগ্রগতি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, কে জানে, একদিন হয়তো আমরা ক্যামেরায় একটি ক্লিক করেই বহুদূরের কোনো ব্ল্যাক হোলের ছবি তুলতে সমর্থ হবো। সে রকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও স্বপ্ন দেখতে তো আর দোষ নেই।

জিরো টু ইনফিনিটিতে আপনিও লিখুন
বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা লিখে পাঠিয়ে দিন shrabanmonir@gmail.com এ

ব্ল্যাকহোলের ছবি তোলার পেছনের গল্প

কুদরতে জাহান জিনিয়া
গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
facebook.com/kudrate.jahan

ডক্টর ক্যাটি বাউম্যান, ২৯ বছর বয়সী এই কম্পিউটারবিজ্ঞানী হঠাৎ করেই খ্যাতি লাভ করেছেন বিশ্বজুড়ে। বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ব্ল্যাক হোলের ছবি তোলার পর কম্পিউটারের সামনে বসা ক্যাটির আনন্দে বিহ্বল চেহারাটি খুবই পরিচিত এখন সবার কাছে। যুগান্তকারী সেই ছবিটিতে মেসিয়ার ৮৭ ছায়াপথের কেন্দ্রে থাকা একটি ভারী ব্ল্যাক হোল এবং তাকে ঘিরে রাখা গ্যাস ও ধুলার বলয় দেখা যাচ্ছে। ব্ল্যাক হোলের এই ছবিটি তোলা হয় একটি ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ দিয়ে, যেটা কি না বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে থাকা আটটি টেলিস্কোপের একটি সম্মিলিত নেটওয়ার্ক। টেলিস্কোপটি চলছিল বাউম্যানের অ্যালগরিদমকে কাজে লাগিয়ে।

বছর তিনেক আগে এমআইটিতে স্নাতক করার সময় এই অ্যালগরিদমটি বানানো শুরু করেছিলেন তিনি। এই প্রজেক্টে তার সহযোগী হিসেবে ছিলেন এমআইটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স ল্যাবরেটরি, দ্য হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এবং দ্য এমআইটি হেস্টেক অবজার্ভেটরির প্রায় দু' শয়েরও বেশি বিজ্ঞানী। সে সময়, ২০১৬ সালে টেড টক-এ দেওয়া এক বক্তৃতায় ব্ল্যাক হোলের ছবি তোলার ব্যাপারে নানা তথ্য দিয়েছিলেন তিনি। চলুন, ৫.৫ কোটি আলোকবর্ষ দূরের এই ছবিটি তোলার পেছনের গল্পটি জেনে আসি তারই জবানীতে।

‘ইন্টারস্টেলার (২০১৪)’ চলচ্চিত্র থেকে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের চেহারা সম্পর্কে বেশ ভালো একটি ধারণা পাই আমরা *(আগের পৃষ্ঠায় উপরের ছবিটি)*। উজ্জ্বল গ্যাসের পটভূমিতে থাকা ব্ল্যাক হোলটির শক্তিশালী মহাকর্ষীয় টান আলোকে বাঁকিয়ে রিংয়ে পরিণত করে। দেখতে বাস্তব লাগলেও এটা কিন্তু কোনো আসল ছবি ছিল না। কম্পিউটার গ্রাফিক্সের সাহায্যে নির্মিত ব্ল্যাকহোলের একটি শৈল্পিক রূপ ছিল মাত্র।

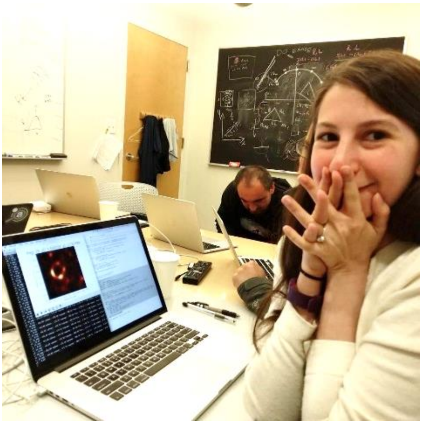

চিত্র: ব্ল্যাক হোলের ছবির সামনে আনন্দে বিহ্বল ক্যাটি বাউম্যান

প্রায় ১০০ বছর আগে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তার থিওরি অব জেনারেল রিলেটিভিটি প্রকাশ করেন। তারপর থেকেই বিজ্ঞানীরা এই থিওরির পক্ষে অসংখ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এই থিওরি দিয়ে ব্ল্যাক হোলের উপস্থিতির কথা আন্দাজ করা গেলেও তাকে এখনো পর্যন্ত সরাসরি দেখা সম্ভব হয়নি। ব্ল্যাক হোলের চেহারা সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকলেও এখনো পর্যন্ত একটাও ছবি তুলতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। তবে শুনলে অবাক হবেন, এই পরিস্থিতি শীঘ্রই বদলাতে যাচ্ছে। আমরা হয়তো আগামী কয়েকবছরের মধ্যেই প্রথমবারের মতো একটি ব্ল্যাক হোলের চেহারা দেখতে যাচ্ছি।

এর পেছনে ভূমিকা রাখবে পৃথিবীর প্রায় সমান আকৃতির টেলিস্কোপ, বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীদের একটি দল এবং একটি বিশেষ অ্যালগরিদম যেটি ঐ টেলিস্কোপে তোলা ছবিগুলো একত্রিত করবে। আজ হয়তো আপনাদের সত্যিকারের একটি ব্ল্যাক হোলের ছবি দেখাতে পারব না। তবে ছবিটি তোলার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে হালকা একটু ধারণা দিতে পারি।

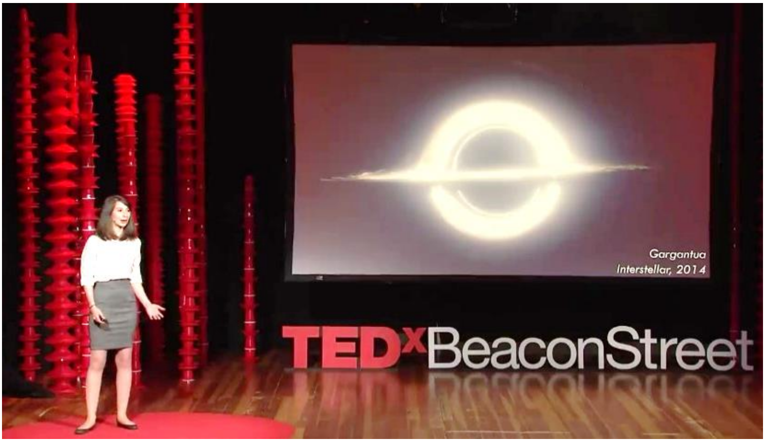

চিত্র: টেড টকে বক্তৃতা দিচ্ছেন ক্যাটি বাউম্যান

আমার নাম ক্যাটি বাউম্যান, আমি এ মুহূর্তে এমআইটিতে পিএইচডি করছি। কম্পিউটার সায়েন্স ল্যাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে আসা ছবি এবং ভিডিও নিয়ে গবেষণা করাই আমার কাজ। জ্যোতির্বিজ্ঞানী না হয়েও কীভাবে এই দারুণ প্রজেক্টের অংশ হলাম, তা-ই আজকে আপনাদের বলব আমি।

কৃত্রিম আলোয় আলোকিত রাতের শহরে বের হয়ে আকাশের দিকে তাকালে হয়তো আপনারা আমাদের ছায়াপথের অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য দেখতে পাবেন। সেই দৃশ্যকে জুম করে মিলিয়ন মিলিয়ন নক্ষত্র পার হয়ে ২৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরে গিয়ে আমরা পৌঁছাই আমাদের সর্পিলাকার ছায়াপথের কেন্দ্রে। সেখানে রয়েছে একগুচ্ছ নক্ষত্র।

ইনফ্রারেড টেলিস্কোপের সাহায্যে গ্যালাকটিক ধুলোবালি পার হয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এসব নক্ষত্রকে দেখছেন ১৬ বছর ধরে। তবে এই দীর্ঘ সময়ে নক্ষত্রদের সবচেয়ে দর্শনীয় জিনিসটাই তারা দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, এই নক্ষত্রগুলো এক অদৃশ্য বস্তুকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে।

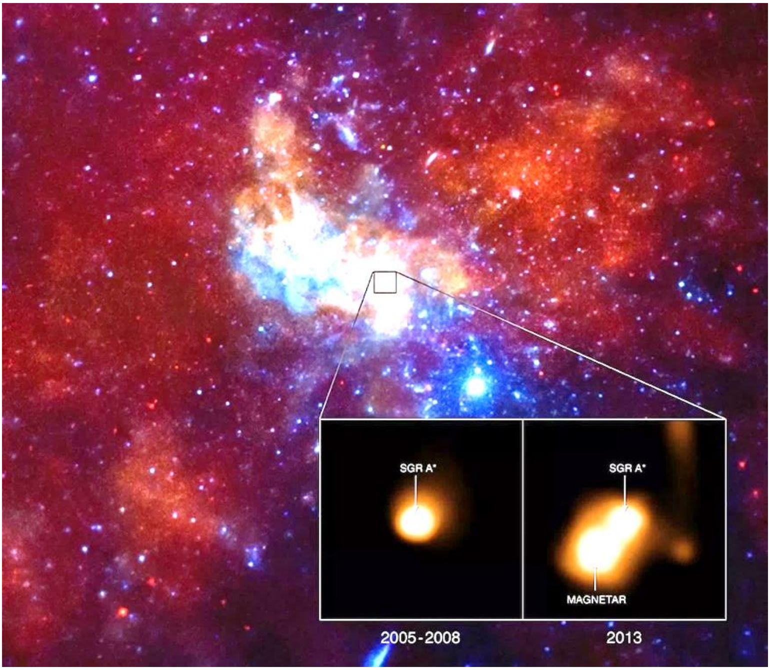

চিত্র: হাজার হাজার আলোকবর্ষ পরিমাণ দূরত্ব জুম করে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের দিকে গেলে দেখে যাবে সেখানে আছে একটি সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল।

তাদের আবর্তন পথের ধরন বিশ্লেষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মত দিয়েছেন, নক্ষত্রগুলোকে নিজের দিকে প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য করবে, এরকম ক্ষুদ্র কিন্তু ভারী জিনিস একটাই আছে। আর তা হলো একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল। এই ব্ল্যাক হোলও আসলে একটি নক্ষত্রই। কিন্তু এর ঘনত্ব এবং ভর এতটাই বেশি যে, এর কাছাকাছি যে যায়, তাকেই গ্রাস করে নেয় এটি। হোক সেটা কোনো গ্রহ, স্পেসশিপ, ধূমকেতু, এমনকি আলোও।

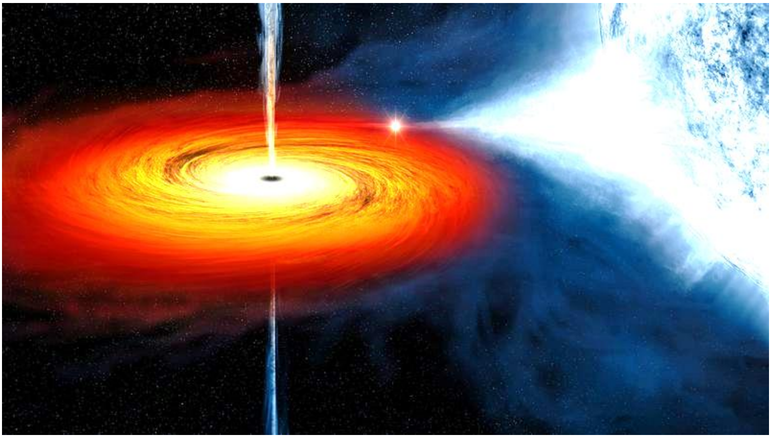

চিত্র: ব্ল্যাক হোল শুষে নেয় সবকিছুকে, এমনকি আলোকেও

এবার আমরা যদি আরো জুম করি, তাহলে কী হবে? বস্তুত অসম্ভব কিছু দেখা কি সম্ভব হবে? আমরা রেডিও তরঙ্গদৈর্ঘ্যে একে জুম করতে শুরু করলাম এবং একটা আলোর রিং দেখতে পেলাম। এই রিং সৃষ্টি করছে ব্ল্যাকহোলের আশেপাশে দ্রুতবেগে প্রদক্ষিণ করতে থাকা উত্তপ্ত প্লাজমার মহাকর্ষীয় গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং। এই রিংয়ের আকার কেমন হবে, তা অনুমান করা গিয়েছিল আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে। ব্ল্যাক হোলের আশেপাশের এলাকায় সমীকরণগুলো কাজ করে, এর ছবি তোলা গেলে সেগুলোর নিখাদ প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আমরা যে ব্ল্যাকহোলটির ছবি তুলছি সেটা পৃথিবী থেকে এত দূরে যে এই আলোর রিংটাকে অনেক ছোট লাগে আমাদের কাছে। চাঁদের মাটিতে থাকা একটা কমলালেবুকে পৃথিবী থেকে দেখতে যতটা ছোট লাগবে, অনেকটা সে রকম। তাই এর ছবি তোলা অসম্ভব দুরূহ একটা ব্যাপার। কেন? একটি মামুলী জটিলতার কারণে। বিস্ময়কর এই মামুলী জটিলতাটির নাম ভগ্নাংশ।

সমীকরণ বলছে, কোনো বস্তু যত ক্ষুদ্র হবে, একে দেখতে হলে তত বড় টেলিস্কোপ বানাতে হবে। অর্থাৎ বস্তুর আকার আর একে দেখতে পাওয়া টেলিস্কোপের আকার পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক। তাই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী অপটিক্যাল টেলিস্কোপ দিয়েও চাঁদের পিঠের কোনো জিনিসের ছবি তোলা সম্ভব না।

চাঁদের পিঠে তোলা সবচেয়ে বেশি রেজুলেশনের ছবিটি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে (নীচে)। এর রেজোলুশন ১৩০০০ পিক্সেল। আর এর প্রতি পিক্সেলে আছে ১.৫ মিলিয়ন কমলা। তাহলে চাঁদের পিঠে একটা কমলালেবু তথা একটি ব্ল্যাকহোল দেখতে আসলে কতবড় টেলিস্কোপ লাগবে?

সংখ্যাগুলোকে সমন্বয় করে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের গোটা পৃথিবীর সমান আকারের একটা টেলিস্কোপ লাগবে। আর সেটা বানাতে পারলেই সেই রিং অব লাইট তথা ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হরাইজন দেখতে পাবো আমরা। যদিও সেখানে কম্পিউটার গ্রাফিক্সে বানানো

ব্ল্যাকহোলের মতো সব খুঁটিনাটি দেখা সম্ভব হবে না, তবে ব্ল্যাক হোলের আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যাবে।

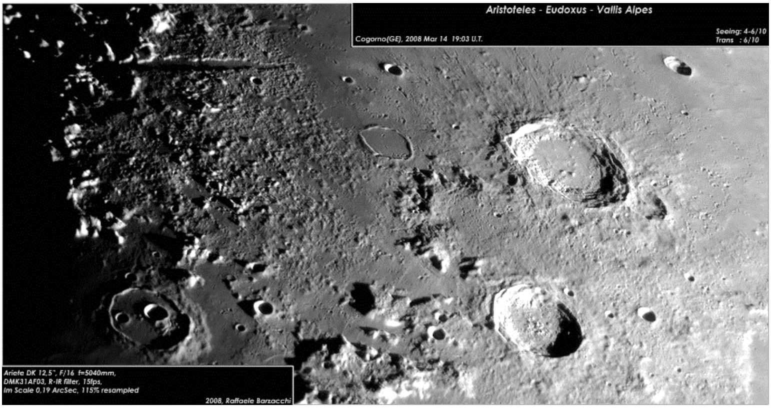

চিত্র: চাঁদের বুকের ছবি। ১৩০০০ পিক্সেলের এই ছবিটির প্রতিটি পিক্সেলে জায়গা নেবে দেড় মিলিয়ন কমলালেবু!

পৃথিবীর সমান সিঙ্গেল ডিস্ক টেলিস্কোপ বানানো অসম্ভব। তবে বিখ্যাত গায়ক মিক জ্যাগারের ভাষ্যে, "*তুমি যা চাইবে, তা হয়তো সবসময়ে পাবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে কাজে লাগানো যাবে, এমন কিছু পেলেও পেতে পারো।*"

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা টেলিস্কোপগুলোর আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে অসম্ভবকে সম্ভব করা যেতে পারে। ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হরাইজন নির্ণয় করা যাবে বলে এই কম্পিউটেশনাল টেলিস্কোপকে বলা হচ্ছে ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ।

ওয়ার্ল্ডওয়াইড নেটওয়ার্কের প্রতিটি টেলিস্কোপ কাজ করে একসাথে। অ্যাটমিক ঘড়ির সূক্ষ্ম হিসাব দ্বারা যুক্ত থাকা প্রতিটি স্থানের গবেষক দল হাজার হাজার টেরাবাইট ডাটা সংগ্রহ করেন। এই ডাটাকে পরে ম্যাসাচুসেটসের একটি ল্যাবে প্রসেসিং করা হয়।

কিন্তু পৃথিবীর সমান টেলিস্কোপ বানাবো যায় কীভাবে? বানাতে হলে তো এই পৃথিবীকে একটি বিশালকায় ঘূর্ণায়মান ডিসকো বল-এ পরিণত করতে হবে। এমনটা তো আর সম্ভব নয়, তাই ভিন্ন উপায়ে হাঁটতে হবে।

প্রতিটি আয়না থেকে সংগৃহীত আলো দিয়ে আমরা পূর্ণাঙ্গ একটি ছবি জোড়া দিতে পারব। ধরুন, ডিস্কো বলের গায়ে থাকা অল্প কয়েকটা আয়না বাদে বাকিগুলো সরিয়ে নিলাম। তারপরেও তথ্যগুলো একত্র করা যাবে, কিন্তু অনেক ফাঁক থেকে যাবে।

চিত্র: *একটি ডিস্কো*

এই রয়ে যাওয়া আয়নাগুলোর অবস্থান দিয়ে আমাদের ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপগুলোর অবস্থান বোঝাচ্ছে।

এখান থেকে ছবি বানানোর জন্য পরিমাণটা খুবই কম। যদিও এ কয়টা টেলিস্কোপ দিয়ে খুব অল্প হিসাব করা যায়, কিন্তু পৃথিবী আবর্তনের সাথে সাথে আমরা আরো নতুন অনেকগুলো পরিমাপ পাই। ব্যাপারটাকে এভাবে বলা যায়, ডিসকো বল ঘোরার সাথে সাথে এই আয়নাগুলোর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে আমরা ছবিটার ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখতে পাই। আমরা যে ইমেজিং অ্যালগরিদমটা বানিয়েছি, তা দিয়ে ডিসকো বলের এই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করা যাবে। তাতে আমরা মূল ব্ল্যাক হোলের ছবিটা পুনঃর্নির্মাণ করতে পারব।

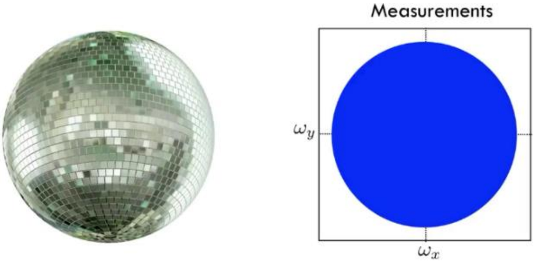

চিত্র: ডিসকো বলরূপী পৃথিবী

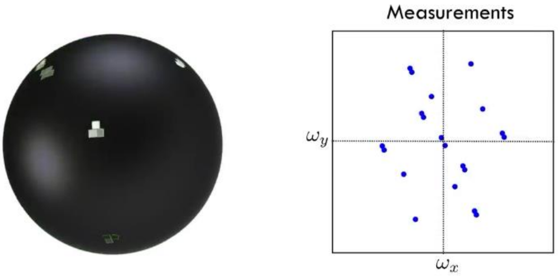

চিত্র: ৮টি আয়নাসমৃদ্ধ ডিসকো বল (পৃথিবী)

যদি ডিস্কো বলের মতো অসংখ্য টেলিস্কোপ থাকত আমাদের, তাহলে কাজটা ছিল মামুলি ব্যাপার। কিন্তু আমরা পাচ্ছি মাত্র অল্প কয়েকটা। ফলে সম্ভাব্য ছবি হতে পারে- এমন ফলাফলের সংখ্যা হয়ে গেছে অগণিত। আমার কাজ ছিল এমন একটা অ্যালগরিদম বানানো, যেটা টেলিস্কোপের পরিমাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা ছবি বানাবে।

একজন ফরেনসিক স্কেচ আর্টিস্ট সামান্য কিছু বর্ণনা শুনে চেহারার গঠনের ব্যাপারে নিজেদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একটা মানুষের চেহারাকে ফুটিয়ে তোলেন। ঠিক তেমনি আমার অ্যালগরিদম সীমিত কিছু টেলিস্কোপের ডাটাকে একটা অর্থপূর্ণ ছবির দিকে নিয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে এসব ডাটাকে অর্থহীন মনে হলেও সেটাকে সিমুলেশনের মাধ্যমে জোড়া দিয়ে ছবি পুনঃর্নির্মাণ বা রি-কন্সট্রাকশন করা সম্ভব। এটা শুধুমাত্র একটা সিমুলেশন হলেও এ ধরনের পুনঃর্নির্মাণ আমাদেরকে ব্ল্যাক হোলের ছবির ব্যাপারে আশা জোগায়।

টেলিস্কোপিক মেজারমেন্ট বর্ণনা করার মতো নিখুঁত ছবির সংখ্যা অনেক, তাদের মধ্যে বেছে নেবার কোনো একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সেজন্য আমরা ব্ল্যাক হোলের ছবিগুলোকে সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে র‍্যাংকিং করি, এবং সবচেয়ে নিখুঁতটাকে বেছে নিই। ধরুন একটা অর্থহীন, একটা ঝাপসা এবং একটা সেলফির মধ্যে কোনটাকে ফেসবুকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি? অবশ্যই সেলফিটাকে। কিন্তু তাতেও সমস্যা। আগে কখনো ব্ল্যাক হোল না দেখায় এর চেহারার ব্যাপারে ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলাম আমরা।

প্রশ্ন উঠলো, আমরা ব্ল্যাক হোলকে কীসের মতো দেখতে ধরে নেব? আমাদের করা সিমুলেশন থেকে ব্ল্যাক হোলের ছবি ধরে নিতে পারি, 'ইন্টারস্টেলার' চলচ্চিত্রের ব্ল্যাক হোলটার মতো দেখতে অনেকটা। কিন্তু সেটা করলে বিভিন্ন সমস্যা হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। আইনস্টাইনের থিওরিটা ভুল প্রমাণিত হলেই বা কী হবে? আমরা কিন্তু তার পরেও একটা ব্ল্যাক হোলের ছবি পুনঃর্নির্মাণ করতে চাইব। তাই আমাদের অ্যালগরিদমটা বানানোর সময়ে আইনস্টাইনের থিওরির উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করা যাবে না। যদি করি, তাহলে আমরা আমাদের পরিচিত এই ব্ল্যাক হোলের মতোই একটা ছবি পাবো, নতুন কিছু পাবার আশা থাকবে না। অন্য কথায়, যেকোনো কিছু দেখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এমনও হতে পারে যে, ব্ল্যাক হোলটা দেখতে গোল ধরনের কিছু নয়, হতে পারে একটা বিশাল হাতির মতো!

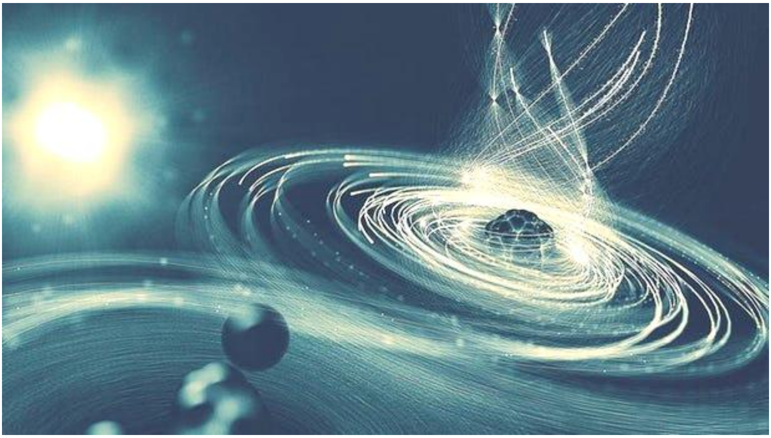

চিত্র: ব্ল্যাক হোলের আকার কেমন হবে সে বিষয়ে এখনো (২০১৬) জানি না আমরা।

আমাদের অ্যালগরিদমকে ব্ল্যাক হোলের চেহারা বোঝাতে হবে। পাশাপাশি আমাদের কল্পিত ব্ল্যাক হোলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যিও চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এ কাজ করতে গেলে অ্যালগরিদমকে ভিন্ন ভিন্ন ছবির সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে এবং দেখতে হবে যে আমাদের কল্পিত ব্ল্যাক হোলের ধারণাটা আমাদের ছবিকে কীভাবে প্রভাবিত করে।

সবগুলো ছবি পুনঃর্নির্মাণ করে যদি একই ধরনের ছবি পাওয়া যায়, তাহলে আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারব যে, আমাদের অনুমান করা ছবির দিকে এই ছবির পক্ষপাতিত্ব নেই।

ধরুন, আমরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের তিন জন স্কেচ আর্টিস্টকে একই চেহারার বর্ণনা দিলাম। যদি তিনটা ছবি অনেকটা কাছাকাছি হয়, তাহলে নিজেদের বর্ণনার উপর আমাদের আত্মবিশ্বাস আসবে এবং আমরা বুঝব যে চিত্রশিল্পীরা তাদের দেশীয় মানুষের চেহারার উপর পক্ষপাতিত্ব করে ছবিগুলো আঁকেনি। আমরা অ্যালগরিদমকে ভিন্ন ভিন্ন পাজল পিস দিয়ে দেখব যে সবগুলো ছবি একইরকম হয় কি না। এবং ফলাফল ছিল ইতিবাচক। আর তাতে অ্যালগরিদমের ব্যাপারে আমাদের আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গেল।

আশা করা যায়, ব্ল্যাক হোলের ছবির মাধ্যমে বিখ্যাত যে থিওরিগুলো বিজ্ঞানীরা নিয়মিত ব্যবহার করে থাকেন, সেগুলোও যাচাই করা যাবে।

দুর্দান্ত এক গবেষক দলের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তেমন কোনো পড়াশোনা না থাকা সত্ত্বেও আমি এই ব্ল্যাক হোল বিষয়ক প্রজেক্টে কাজ করতে পেরেছি, আর আমাদের সফল হবার সম্ভাবনাও অনেক। আমাদের এই বিচিত্র দলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি আছেন পদার্থবিদ, গণিতবিদ ও প্রকৌশলীরা।

চিত্র: এই প্রজেক্টে কাজ করা বিজ্ঞানীরা।

আজকে আপনাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করার জন্য বলছি, বিজ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। এমনকি সেটা ব্ল্যাকহোলের মতো রহস্যময় কোনো কিছু হলেও চেষ্টা করে দেখতে তো দোষ নেই। ধন্যবাদ।

ক্যাটি বাউমানের দেওয়া টেড টক লেকচার থেকে অনুবাদকৃত-
মূল লেকচার: How to take a picture of a black hole | Katie Bouman | TED
লিংক: ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like

এন্টার্কটিকায় ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ। এটি সহ পৃথিবীর আরো সাতটি অঞ্চলের টেলিস্কোপের ডাটা নিয়ে তোলা হয় ব্ল্যাকহোলের কালজয়ী প্রথম ছবিটি।

মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় জিনিস কী?

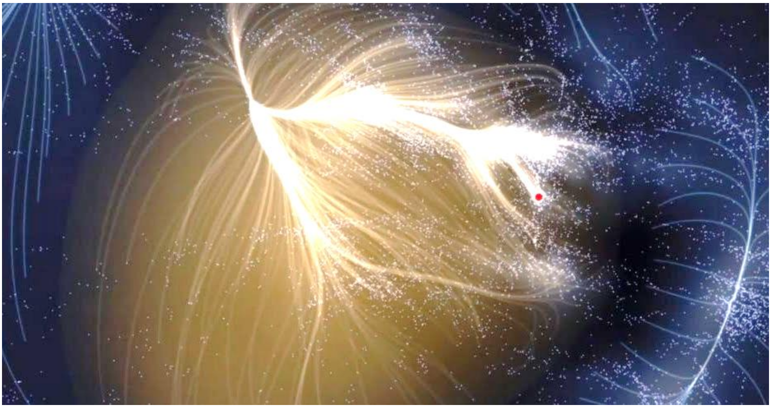

আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করছি তা অনেক বিশাল। সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়ালে বোঝা যায় কতটুকু বিশালতা ধারণ করছে নীল এই গ্রহটি। কিন্তু স্বাভাবিক চোখে পৃথিবীকে খুব বিশাল মনে হলেও মহাজাগতিক স্কেলে পৃথিবী একদমই ছোট একটি বস্তু। এমনকি খুব ক্ষুদ্র জগত সৌরজগতের সাথে তুলনা করলেও পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা মোটা দাগে চোখে পড়ে। সৌরজগতের পঞ্চম গ্রহ বৃহস্পতির তুলনায়ও পৃথিবী অনেক ছোট। নাসার মতে প্রায় ১ হাজারটা পৃথিবী ঢুকে যেতে পারবে বৃহস্পতির বুকে। সামান্য একটি গ্রহের তুলনায়ও পৃথিবীকে ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। সূর্যের সাথে তুলনা করলে, প্রায় ১ মিলিয়নেরও বেশি পরিমাণ পৃথিবীকে সূর্যে তার বুকে ধারণ করতে পারবে।

এত বিশাল সূর্যকেও খুব ক্ষুদ্র মনে হবে যদি আরেকটি বড় তারার সাথে তুলনা করা হয়। তারাদের শ্রেণিবিন্যাসে সূর্য হলো ছোট ধরনের তারা (G-Type)। এমন কিছু তারা আছে যারা অনেক অনেক বিশাল। এখন পর্যন্ত জানা সবচেয়ে বড় তারাটি হচ্ছে UY Scuti। প্রায় ১৭ হাজারের চেয়েও বেশি পরিমাণ সূর্য এর ভেতরে জায়গা করে নিতে পারবে। তবে আকৃতিতে হাজার গুণ বিশাল হলেও ভরের দিক থেকে এত বেশি নয় এটি। সূর্যের চেয়ে মাত্র ৩০ গুণ ভারী। নক্ষত্রের বেলায় আকারে বড় হলেই ভরে বেশি হয়ে যায় না। ভর ও আকার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নয়।

ভরের দিক থেকে কিংবা মাঝে মাঝে আকারের দিক থেকে বিশালতায় এর পরেই আসে ব্ল্যাকহোলের নাম। ব্ল্যাকহোলকে পেরিয়ে গেলে আসবে সুপারম্যাসিভ (অতিভারী) ব্ল্যাকহোলের নাম। এই ধরনের অতিভারী ব্ল্যাকহোলগুলো সাধারণত গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থান করে। আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রেও এমন একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল আছে। এটি সূর্য থেকে চার মিলিয়ন গুণ বেশি ভারী। এখন পর্যন্ত শনাক্ত করা সবচেয়ে ভারী ব্ল্যাকহোলটি সূর্য থেকে ২১ মিলিয়ন গুণ ভারী। এটি অবস্থান করছে কোমা ক্লাস্টারে। অনেকগুলো গ্যালাক্সি মিলে ক্লাস্টার গঠন করে। কোমা ক্লাস্টারের অধীনে প্রায় ১ হাজারের মতো গ্যালাক্সি আছে।

গ্যালাক্সিগুলো আকারে অনেক বিশাল হয়ে থাকে। একটি গ্যালাক্সিতে অনেকগুলো তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, বামন গ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু, ধূলিকণা ইত্যাদি সব আছে। বিশালতায় এরা

সাধারণ মানুষের কল্পনাকেও হারিয়ে দিতে পারে। আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি প্রায় ১ লক্ষ আলোক বর্ষ পরিমাণ বিস্তৃত। অর্থাৎ কেউ যদি মিল্কি ওয়ের এক প্রান্ত থেকে শুরু করে প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার করে এগিয়ে যায় এবং দিন রাতের কোনো বিরতি না থাকে তাহলে পুরোটা পার হতে ১ লক্ষ বছর লেগে যাবে।

গ্যালাক্সিদের মাঝে কোনটা সবচেয়ে বড় তা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ এর স্বাভাবিক কোনো সীমা থাকে না। গ্রহ নক্ষত্রের পাশাপাশি এদের গ্যাসীয় বহিরাবরণও থাকে। যেমন আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিরও গ্যাসীয় বহিরাবরণ আছে। তবে এখন পর্যন্ত নির্ণয় করা সবচেয়ে বড় গ্যালাক্সিটি কয়েক মিলিয়ন আলোক বর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

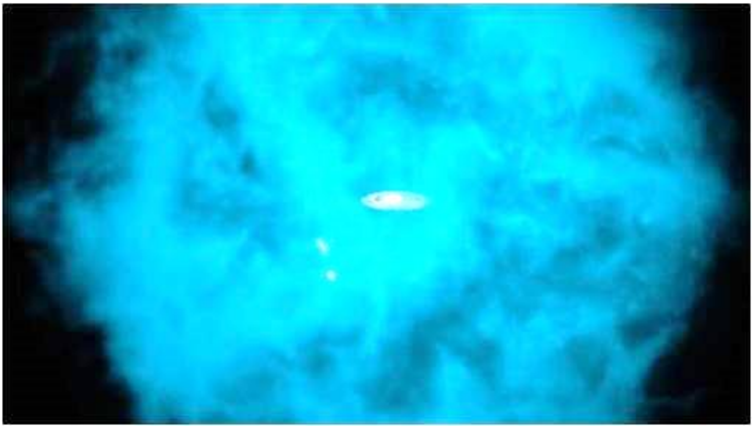

চিত্র: মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির গ্যাসীয় বহিরাবরণ।

এর চেয়েও বড় আকৃতির সিস্টেম হচ্ছে গ্যালাক্সি ক্লাস্টার। অনেকগুলো গ্যালাক্সি একত্রে মিলে একটা মহাকর্ষীয় আকর্ষণে বাঁধা পড়ে ক্লাস্টার গঠন করে। আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিও আরো প্রায় দুই ডজন গ্যালাক্সির সাথে মিলে একটা ক্লাস্টারের অন্তর্গত। এই ক্লাস্টারের অধীনে এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিও আছে।

গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের চেয়েও বড় কিছু থাকতে পারে এই ব্যাপারটি ভাবতেও সাহস লাগে। ১৯৮০ এর আগে এমন কোনোকিছু পাওয়া যায়নি যা ক্লাস্টারের চেয়ে বড়। ১৯৮০ সালের দিকে জ্যোতির্বিদরা খেয়াল করে দেখলেন অনেকগুলো ক্লাস্টার মিলেও অভিন্ন একটি অভিকর্ষীয় আকর্ষণের অধীনে থাকতে পারে। এই ধরনের অতি-বিশাল সিস্টেমকে বলা হয় সুপার ক্লাস্টার।

এখন পর্যন্ত জানা সবচেয়ে বড় সুপার ক্লাস্টার হচ্ছে Hercules-Corona Borealis Great Wall। এর ব্যাপারে প্রথম নিশ্চিত ধারণা হয় ২০১৩ সালে। এটি এতই বিশাল যে কল্পনাও করা যায় না। এর বিস্তৃতি ১০ বিলিয়ন আলোক বর্ষ। সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার করে চললে এর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে ১০ বিলিয়ন বছর লেগে যাবে। উল্লেখ্য এই মহাবিশ্বেরই বয়স ১৩.৭ বিলিয়ন বছর। সেই তুলনায় এর বিশালতা কল্পনাতীত। এখন পর্যন্ত এটিই এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় জিনিস বা সিস্টেম।

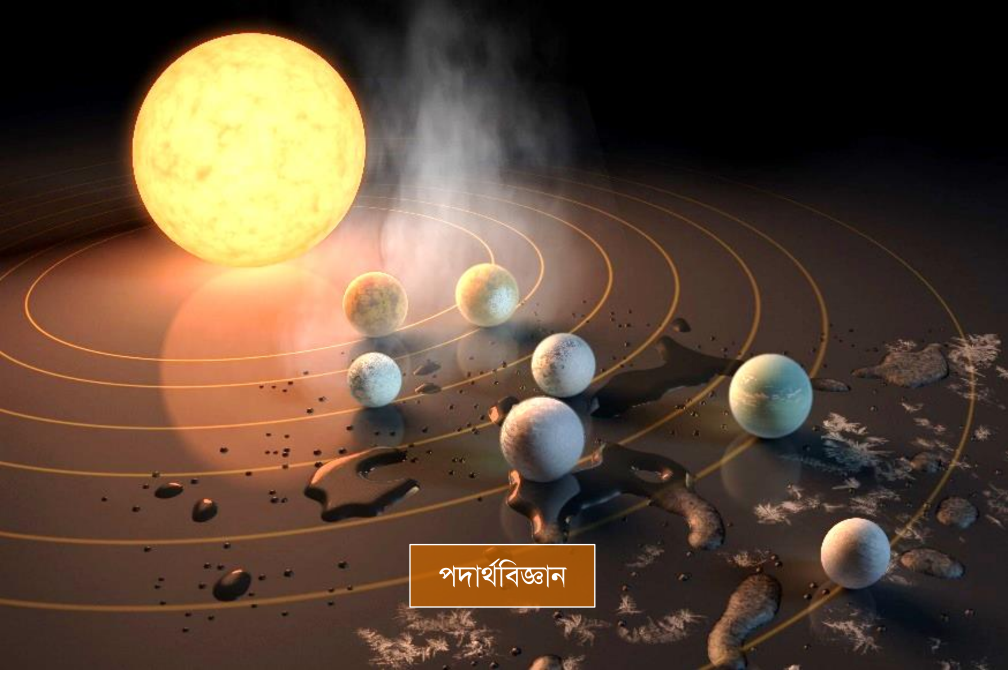

বিজ্ঞানীরা কীভাবে দূরের গ্রহের ভর মাপেন

সিরাজাম মুনির শ্রাবণ
সম্পাদক, জিরো টু ইনফিনিটি
facebook.com/monirul.1971

বেশ কয়েক বছর আগেও সকলের ধারণা ছিল প্রাণ ধারণের উপযোগী গ্রহ শুধু এই সূর্যের পরিবারেই আছে। অন্য কোথাও পৃথিবীর মতো এত উপযুক্ত গ্রহের অস্তিত্ব নেই। আসলে তাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তখনো জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তেমন উন্নত হয়নি। এমনকি ভালো মানের টেলিস্কোপ দিয়েও দূরবর্তী গ্রহ দেখা যায় না। এ ধরনের টেলিস্কোপ দিয়ে দূরবর্তী নক্ষত্র হয়তো দেখা যায় কিন্তু গ্রহ দেখা যায় না। দূরের গ্রহ যেহেতু চোখে দেখা যায় না তাই যতক্ষণ পর্যন্ত উপযুক্ত যন্ত্র তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সীমাবদ্ধতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

আশার কথা হচ্ছে বর্তমানে আমাদের কাছে পর্যবেক্ষণ করার জন্য সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী যন্ত্রপাতি আছে এবং এগুলো থেকে পাওয়া তথ্য উপাত্ত থেকে আমরা জানতে পারি পৃথিবী ছাড়াও আরো অনেক গ্রহ আছে যেখানে প্রাণের বসবাস থাকা সম্ভব। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রায় প্রতিদিনই এক বা একাধিক গ্রহ আবিষ্কার করে চলছেন।

বিজ্ঞানীরা প্রতিদিন গ্রহ আবিষ্কার করে চলছেন- এরকম কথা শুনলে সম্ভবত কারো কারো মনে মনে ধারণা হতে পারে, বিজ্ঞানীরা খুব বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন টেলিস্কোপ তাক করে

এদিক ওদিক তাকিয়ে থাকেন এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নতুন নতুন গ্রহ শনাক্ত করেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আসলে এভাবে গ্রহ আবিষ্কার করেন না। এভাবে নতুন গ্রহ আবিষ্কার করা যায় না। এক প্রকার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। এত দূর থেকে গ্রহগুলোকে দেখতে হলে গ্রহদের যে পরিমাণ উজ্জ্বল হওয়া প্রয়োজন গ্রহগুলো সে পরিমাণ উজ্জ্বল নয়। গ্রহের নিজস্ব কোনো আলো নেই। গ্রহ যে নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে সেই নক্ষত্রের আলো গ্রহে এসে প্রতিফলিত হয়, এই আলো এতটাই স্বল্প যে এত দূর থেকে শনাক্ত করার জন্য তা একদমই অপ্রতুল।

মোদ্দা কথা আমরা এদেরকে 'সরাসরি' শনাক্ত করতে পারব না। এদেরকে শনাক্ত করতে হলে ভিন্ন রাস্তায় পরোক্ষ উপায়ে চেষ্টা করতে হবে। পরোক্ষ উপায়ে গেলে আমাদেরকে দ্বারস্থ হতে হবে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র বা স্পেকট্রোস্কোপের কাছে।

চিত্র: একটি সাধারণ বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র।

আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে যখন প্রায় সমান পরিমাণ ভারী দুটি বস্তু পরস্পর কাছাকাছি অবস্থান করে তখন তারা উভয়েই উভয়কে আবর্তন করতে থাকে। প্রায় সমান ভরের দুটি নক্ষত্র যদি কাছাকাছি অবস্থান করে তাহলে তারা একে অপরকে আবর্তন করবে। এরকম পরস্পর আবর্তনকারী নক্ষত্র আছেও অনেক। আকাশে যেসকল নক্ষত্রকে খুব বেশি উজ্জ্বল হিসেবে দেখা যায় তাদের মধ্যে অনেকগুলোই এরকম পরস্পর আবর্তনকারী নক্ষত্র। এ ধরনের নক্ষত্র ব্যবস্থাকে বলা হয় 'যুগল নক্ষত্র' বা 'বাইনারি স্টার'।

যুগল নক্ষত্র ব্যবস্থার আবর্তনপথ।

যুগল নক্ষত্রের আবর্তনের পথ কিছুটা অদ্ভুত রকমের হয়। একবার সামনে একবার পেছনে, এরকম করে তাদের আবর্তনের যে পথ রচিত হয় তা আকারের দিক থেকে অনেকটা মুগুরের মতো। মনে হবে যেন একটা অদৃশ্য রশি দিয়ে তারা পরস্পর বাধা।

এরকম ক্ষেত্রে কোনো একটি বস্তু যদি অপরটি থেকে তুলনামূলকভাবে ছোট বা কম ভারী হয় তাহলে ছোট বস্তুটি বেশি ঘুরবে আর বড় বস্তুটি কম ঘুরবে। এরকম একটি উদাহরণ হচ্ছে স্বয়ং আমাদের পৃথিবী ও সূর্য। আমরা সকলেই হয়তো জানি পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে পৃথিবীর ভরও অনেক বিশাল এবং এই পরিমাণ ভরের মহাকর্ষীয় শক্তিকে ব্যবহার করে সূর্যকে অল্প হলেও প্রভাবিত করা সম্ভব। সূর্যও আসলে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে, তবে তার পরিমাণ খুব সূক্ষ্ম বলে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

গ্রহ যদি বৃহস্পতির মতো বিশাল ও ভারী হয় তাহলে এরকম গ্রহ কর্তৃক আকর্ষণের টান সহজে দেখা যাবে। বৃহস্পতি গ্রহ সূর্যকে বেশ শক্তিশালী বলে আকর্ষণ করছে এবং সূর্য তাতে সাড়া দিয়ে আবর্তনও করছে। এই আবর্তনের পরিমাণ মোটামুটি বেশি যার কারণে সূর্য ও বৃহস্পতির পারস্পরিক আবর্তন সহজে ধরা পড়ে। সূর্য ও বৃহস্পতির মতো এরকম অনেক নক্ষত্র ও গ্রহ আছে যারা একে অপরকে আবর্তন করে। গ্রহ-নক্ষত্রের পারস্পরিক আবর্তনের এই বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে নতুন নতুন গ্রহ আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা। কীভাবে? প্রক্রিয়াটা বেশ মজার।

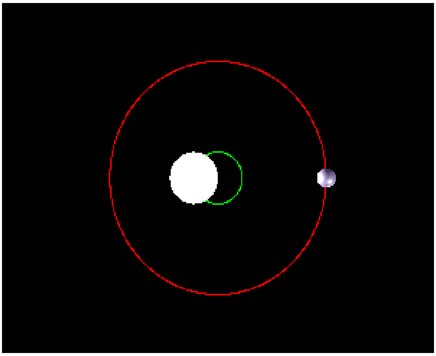

চিত্র: সূর্যও পরোক্ষভাবে গ্রহদের চারপাশে ঘুরে, কিন্তু সেটা দৃষ্টিগোচর হয় না।

বিজ্ঞানীরা আসলে দূরবর্তী গ্রহ নক্ষত্রের আবর্তন বা চলাকে 'দেখে' না বা দেখতে পারে না। কারণ তাদের দূরত্ব এতই বেশি যে অনেক বেগে চললেও তা নজরে নজরে আসে না। খেয়াল করলে দেখা যাবে খুব গতিশীল কোনো বস্তু অনেক দূরে অবস্থান করলে তাকে ধীরগতির মনে হয়। নক্ষত্রগুলো এতই দূরে অবস্থান করে যে তাদের গতি ধীর হতে হতে একদম শূন্য বলে মনে হয়। তবে বিজ্ঞানীরা আবর্তন দেখতে না পারলেও তাদের বেগ পরিমাপ করতে পারেন। দেখে না কিন্তু গতি পরিমাপ করতে পারে, এরকম কোনোকিছু শুনলে ব্যাপারটাকে বেশ অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। মূলত বিজ্ঞানীরা এখানে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে অদ্ভুত ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকতায় নিয়ে এসেছেন।

আলোক রশ্মির ডপলার প্রভাবের কথা মনে আছে? বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে কোনো আলোক রশ্মি প্রেরণ করলে সেটি বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়ে একটি সজ্জা তৈরি করে। উৎস যদি যন্ত্র থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যায় তাহলে সজ্জাটি একদিকে সরে যাবে (ঐদিকে বর্ণালীর লাল অংশ থাকে)। আর উৎস যদি যন্ত্রের কাছে আসতে থাকে তাহলে আলোর সজ্জা উল্টোদিকে যরে যাবে (ঐদিকে নীল অবস্থান করে)।

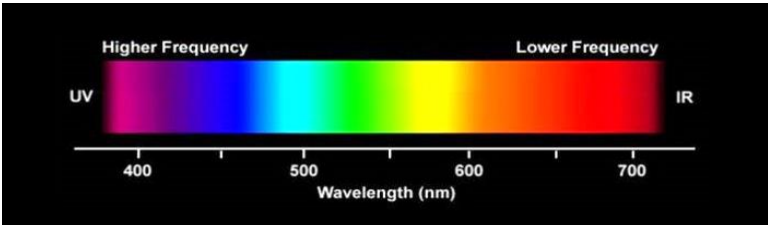

চিত্র: বর্ণালীতে রঙের অবস্থান, একদিকে লাল আরেকদিকে নীল।

যদি কোনো নক্ষত্রে আবর্তনকারী ভারী গ্রহ থাকে এবং নক্ষত্র সেই গ্রহের আকর্ষণে প্রভাবিত হয় তাহলে ঐ নক্ষত্রের চলাচল এলোমেলো হবে। একবার সামনে যাবে আবার পেছনে আসবে। আবার সামনে যাবে আবার পেছনে সরে আসবে।

ফলে বিলিয়ন বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে এই পৃথিবীতে স্থাপিত বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে নক্ষত্রের বর্ণালীরেখা একবার লালের দিকে যাবে আরেকবার নীলের দিকে আসবে। এভাবে চক্রাকারে লাল-নীল-লাল-নীল-লাল-নীল চলতেই থাকবে। যদি কোনো নক্ষত্র এরকম চক্রাকার বর্ণালী প্রদান করে তাহলে বিজ্ঞানীরা ধরে নেয় এই নক্ষত্রের মাঝে ভারী কোনো গ্রহ আছে। এই চক্রকে বিশ্লেষণ করে তার ভর সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। অথচ বিজ্ঞানীরা এই গ্রহটিকে দেখতে পায়নি, কারণ গ্রহটির কোনো আলো নেই। পরোক্ষভাবে বর্ণালীকে ব্যবহার করে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে। এজন্যই বলতে হয় পদার্থবিজ্ঞান আসলেই জাদুর খেলা।

শুধু তা-ই নয়, লাল অংশ থেকে নীল অংশে যেতে একটি নক্ষত্রের যে পরিমাণ সময় লাগে তা থেকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বলে দিতে পারেন ঐ গ্রহে কত দিনে এক বছর হয় তথা কত সময়ে গ্রহটি নিজের কক্ষপথকে আবর্তন করে। আমাদের পৃথিবী তার কক্ষপথকে প্রায় ৩৬৫ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাই এখানে ৩৬৫ দিনে এক বছর। অন্যান্য গ্রহে এই সময়ের হেরফের হয়। কোনো কোনো গ্রহের বেলায় এর চেয়ে কম সময় লাগে আবার কোনো কোনো গ্রহের বেলায় এর চেয়ে বেশি সময় লাগে।

চিত্র: চীনে অবস্থিত একটি শক্তিশালী টেলিস্কোপ। এর আকৃতি একটি ফুটবল মাঠের সমান।

নক্ষত্র ব্যবস্থায় যখন কয়েকটি গ্রহ থাকে এবং নক্ষত্রটি সকল গ্রহের আকর্ষণে কম-বেশি সাড়া দেয় তখন হিসাবের মধ্যে বেশ জটিলতার জন্ম হয়। এক গ্রহের আকর্ষণের সাথে আরেক গ্রহের আকর্ষণ মিলে একটা তালগোল পাকানো অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে একটি গ্রহের তথ্য উদ্ধার করে আনা অবশ্যই খুব কঠিন কাজ। কিন্তু আমাদের জ্যোতির্বিদরা খুব বুদ্ধিমান এবং গণিতে বেশ দক্ষ। তারা গাণিতিক কৌশিলকে ব্যবহার করে এসব জটিলতাকে উৎরে গ্রহ সম্বন্ধে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই বর্ণালী পদ্ধতি ব্যবহার করে এখন পর্যন্ত অনেক অনেক গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এর পরিমাণ বেড়েই চলছে।

গ্রহ শনাক্ত করার জন্য এটি ছাড়াও আরো কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যেমন এদের মাঝে একটি হচ্ছে ছায়া বা গ্রহণ পদ্ধতি। যদি কোনো নক্ষত্রের দিকে আমরা টেলিস্কোপ তাক করি এবং ঐ সময়ে ঐ বরাবর কোনো গ্রহ তার কক্ষপথে আবর্তন করে তাহলে গ্রহটির কারণে একটি প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে। গ্রহের আড়ালের কারণে নক্ষত্রের একটি অংশ দেখা যাবে না। টেলিস্কোপে ঐ অংশটিকে কালো ফুটকি হিসেবে দেখা যাবে। কালো ছোট দাগটি যদি স্থির না থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে তাহলে ধরে নিতে হবে এটি ঐ নক্ষত্রের একটি গ্রহ যা নক্ষত্রটিকে আবর্তন করছে। এই পদ্ধতিও অনেকগুলো গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই দুটি ছাড়াও গ্রহ শনাক্ত করার আরো কয়েকটি পদ্ধতি আছে। সেসব পদ্ধতিতেও অনেকগুলো গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

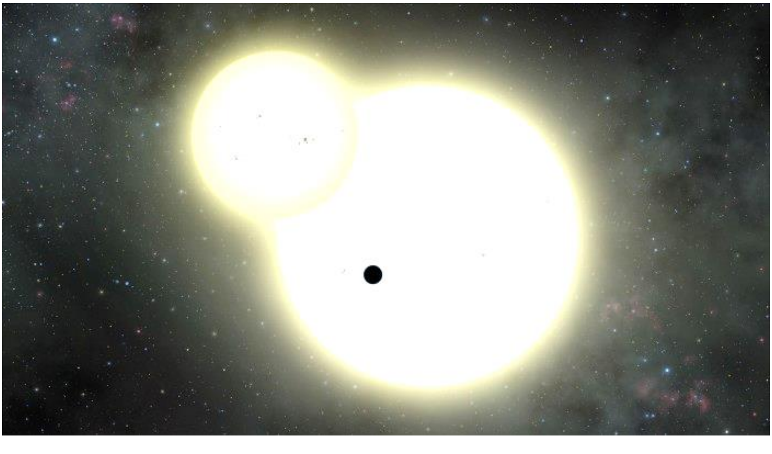

চিত্র: নক্ষত্রের বিপরীতে গ্রহকে কালো ফুটকীর মতো দেখাবে।

আর দূরবর্তী গ্রহ নক্ষত্র কত দূরে আছে সেটা কীভাবে নির্ণয় করে? দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য প্যারালাক্স পদ্ধতি, ভ্যারিয়েবল স্টার পদ্ধতি প্রভৃতি আছে। সেখানেও কাজ করছে পদার্থবিজ্ঞানের জাদুর খেলা। দূরবর্তী গ্রহ নক্ষত্রের ধারে কাছে না গিয়েই বিজ্ঞানের কিছু ট্রিক ও গণিতকে কাজে লাগিয়ে জেনে নেয়া যায় সেসব গ্রহ সম্পর্কে।

সূত্র: দ্য ম্যাজিক অব রিয়্যালিটি

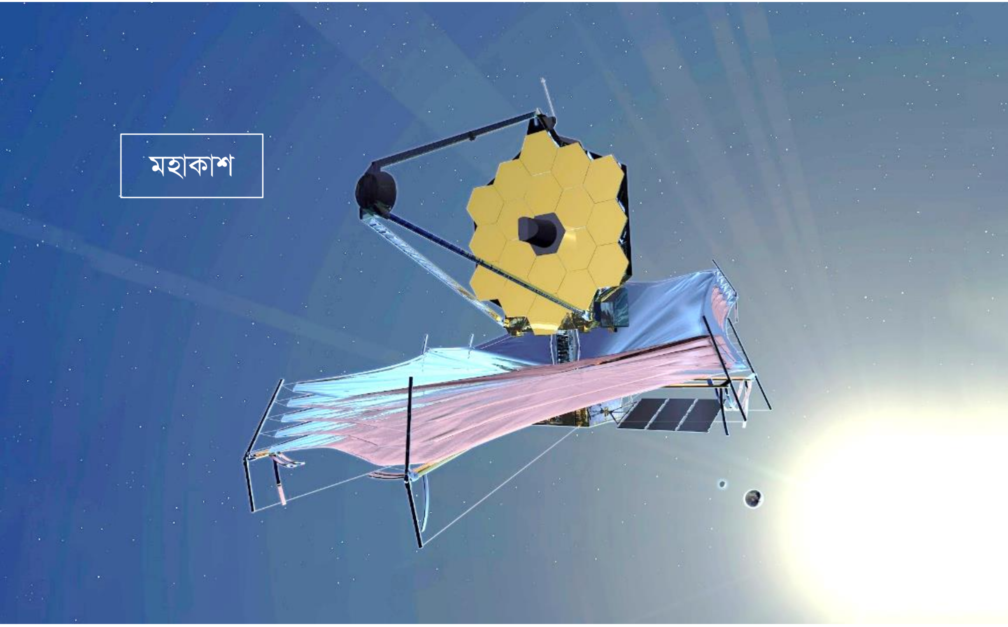

মহাকাশ

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ

তাশীন আহাম্মদ অমি
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

টেলিস্কোপ বা দূরবীন দিয়ে সাধারণত দূরের কোনো বস্তুকে কাছে দেখা যায়। কিন্তু কত দূরের বস্তু? সাধারণ যেসব টেলিস্কোপ আমরা ব্যবহার করি তা দিয়ে হয়তো কয়েক কিলোমিটার অথবা আরো উন্নতমানের হলে আরো বেশি দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পারব। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কয়েক কিলোমিটার কিংবা কয়েক হাজার কিলোমিটারেও সন্তুষ্ট নন। তারা মহাকাশের বাইরে লক্ষ লক্ষ আলোক বর্ষ দূরের ঘটনা দেখতে চান। আলোক বর্ষ দূরের- কথাটি শুনতে সাধারণ হলেও এটি পরিমাণে খুবই বেশি। আলো এক বছরে যতটুকু পথ অতিক্রম করে ততটুকু পথ হলো এক আলোক বর্ষ।

আমাদের চোখে কোনো বস্তু দৃশ্যমান হয় তখনই যখন সেই বস্তু থেকে আলোকরশ্মি আমাদের চোখে এসে লাগে। তাহলে এক আলোকবর্ষ দূরের কোনোকিছু দেখার মানে হলো ঐ দৃশ্যটি এক বছর আগেই ঘটে গেছে।

আমরা যত দূরের ঘটনা দেখতে পারব আসলে তত পুরনো ঘটনা দেখব। আর মহাবিশ্বের জন্মের রহস্য উদঘাটন করতে পুরনো ঘটনাগুলোর গুরুত্ব প্রচুর। সেজন্য বিজ্ঞানীরা অনেকগুলো স্পেস টেলিস্কোপ পাঠিয়েছেন মহাকাশে। তাদের মাঝে একটি হলো হাবল স্পেস টেলিস্কোপ (HST)। এর মাধ্যমে ১০ কোটি আলোকবর্ষ অর্থাৎ ১০ কোটি বছর আগে ছায়াপথগুলো কেমন ছিল তার ধারণা পাওয়া গেছে।

তবে বিভিন্ন নক্ষত্র কীভাবে তৈরি হয়েছিল, ছায়াপথগুলো কীভাবে গড়ে উঠেছিল তার কোনো স্পষ্ট চিত্র বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করতে পারেননি। তবে আরেকটি মহাকাশ মানমন্দির James Webb Space Telescope (JWST)- পাঠানো হয়েছে এই তথ্য সংগ্রহের জন্য। এর মাধ্যমে আমরা হয়তো আরো দূর পর্যন্ত দেখতে পারব, হয়তো বিগ ব্যাংয়ের পর কীভাবে গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথগুলো গড়ে উঠেছিল তাও দেখতে পারব।

এই টেলিস্কোপের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিগ ব্যাংয়ের ঘটনা ঘটার পর পর সৃষ্ট নক্ষত্র ও ছায়াপথ থেকে আগত আলোকরশ্মির সন্ধান করা। এছাড়া নক্ষত্র, ছায়াপথগুলোর বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা। সৌরজগত কীভাবে গড়ে উঠেছিল, জীবনের উৎপত্তিই বা কীভাবে হয়েছিল এ সকল কিছুর অনুসন্ধানের জন্যই জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ।

চিত্র: নির্মাণের সময় জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ।

কিন্তু এগুলো অনুসন্ধান করে কী হবে? প্রথম দিককার নক্ষত্রের সৃষ্টির তথ্য থেকে আমরা কী পাব? আসলে প্রাণের উৎপত্তির জন্য যে যে রাসায়নিক উপাদান দরকার সেগুলো তৈরি হয়েছিল বিগ ব্যাংয়ের পর পর প্রথম দিককার নক্ষত্রগুলো গড়ে উঠার সময়। বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেকে আমরা জীবনের উৎপত্তির সম্পর্কে অনেক দূর এগিয়েছি, অনেক অনুমান করেছি কিন্তু তারপরেও কোনো সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট জ্ঞান আমাদের নেই। আমাদের জানাশোনার অগ্রগতির জন্য তাই দরকার ব্যাপক অনুসন্ধান।

একটি প্রশ্ন থেকেই যায়—এর আগেও তো কত স্পেস টেলিস্কোপ আমরা মহাকাশে পাঠিয়েছি, হাবল স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে আমরা অনেকদূর পর্যন্ত দেখতেও পেয়েছি, তবুও কেন জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ?

সাধারণ টেলিস্কোপগুলো দৃশ্যমান আলোক রশ্মির মাধ্যমে ছবি তোলে। আর JWST দৃশ্যমানের বদলে অবলোহিত (Infrared) আলোক রশ্মির মাধ্যমে ছবি তোলে। আর আমরা জানি এই মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত প্রসারিত হচ্ছে। ফলে অনেক অনেক আলোকবর্ষ দূরের কোনো বস্তু থেকে দৃশ্যমান আলোকরশ্মি আমাদের কাছে এসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ক্ষীণ হয়ে যায়। ক্ষীণ হয়ে গেলে নষ্ট হয়ে যায় তথ্যের নিখুঁততা।

অনেক দূর থেকে আসলেও সবচেয়ে কম ক্ষীণ হয় অবলোহিত আলোক রশ্মি। কোনো গ্রহের অবলোহিত বিকিরণ থেকে গ্রহের বায়ুমণ্ডল, এমনকি গ্রহের পৃষ্ঠে পানি আছে কিনা তাও যাচাই করা যায়। এর পাশাপাশি JWST-তে আছে আরো বাড়তি সুবিধা। এর প্রাথমিক দর্পণ (যে অংশটিতে আলোকরশ্মি সর্বপ্রথম এসে পড়বে) আকৃতিতে বড় হওয়ায় এর থেকে যে চিত্র পাওয়া যাবে তা অন্য যেকোনো টেলিস্কোপ থেকে স্পষ্ট হবে।

এই টেলিস্কোপের প্রাথমিক দর্পণ মোট ১৮টি ষড়ভুজাকৃতির বেরিলিয়ামের কাঠামো দিয়ে তৈরি। আর কাঠামোগুলোতে আছে স্বর্ণের প্রলেপ। ১৮টি দর্পণ একত্রে করলে ব্যাসার্ধ হয় ৬.৫ মিটার (২১ ফুট ৪ ইঞ্চি)।

প্রশ্ন হতে পারে এত বড় দর্পণের প্রলেপ দেওয়ার জন্য কত পরিমাণ স্বর্ণের দরকার হবে? অনেকের মাথায় অনেক বড় হিসাব খেলতে পারে, তবে প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণের মোট ওজন মাত্র ৪৮.২৫ গ্রাম। প্রলেপের পুরুত্বের কথা বিবেচনা করলে মাত্র ০.০০০০১ সেন্টিমিটার। প্রশ্ন জাগতে পারে এত ধাতু থাকতে বেরিলিয়ামই কেন আর কেনই বা দর্পণে স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া? এত চাকচিক্যের কী দরকার?

চিত্র: বেরিলিয়ামের অনেকগুলো প্লেট দিয়ে গঠিত এই টেলিস্কোপের প্রাথমিক দর্পন।

আসলে চাকচিক্য নয়। তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে পদার্থের আয়তনও পরিবর্তিত হয়। এই টেলিস্কোপকে যখন পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে স্থাপন করা হবে, তখন সূর্যের তাপমাত্রা থেকে রক্ষা করার জন্য যে সিলিকনের পাতলা পর্দা (Sunshield) ব্যবহার করা হবে তার আড়ালে দর্পণের তাপমাত্রা থাকবে অনেক কম। হিমাংকের নিচে -২২০° সেলসিয়াসে নেমে যায়। এত নিম্ন তাপমাত্রায় দর্পণের কাঠামো স্বাভাবিক রাখার জন্য স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া বেরিলিয়ামই সবচেয়ে উপযোগী।

এখন প্রশ্ন হলো কীভাবে এই দর্পণকে ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত ছবি তোলা হয়? ১৮টি খণ্ড এমনভাবে সাজানো থাকবে যা একটি উত্তল দর্পণের মতো কাজ করবে এবং যখন আলোকরশ্মি এর উপর এসে পড়বে তা প্রতিফলিত এবং সংকুচিত হয়ে দ্বিতীয় একটি

উত্তল দর্পণে আপতিত হবে, তারপর যাবে তৃতীয় দর্পণে। সেখানে বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি সংগ্রহ করে সেটিকে ছবিতে রূপান্তরের জন্য পেছনের যন্ত্রে পাঠানো হবে। এসবের সাহায্যে যে ছবিটা পাওয়া যাবে তা অনেক সূক্ষ্ম এবং প্রশস্ত (wide view) হবে।

কবে মহাকাশে পা রাখবে এই শক্তিশালী টেলিস্কোপ? এর প্রকল্প ও পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। তখন এটিকে ২০০৭ - ২০১১ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্পের বাজেট অনুসারে খরচ বেশি হওয়া এবং ২০০৫ সালে টেলিস্কোপের নকশায় পরিবর্তন আনার কারণে বারবার এর উৎক্ষেপনের তারিখ পরিবর্তিত হতে থাকে। এমনকি ২০১১ সালে এই প্রকল্প বাতিলের কথাও ওঠে।

অবশেষে নতুন করে বাজেট করা হয় এবং ২০১৮ সালের অক্টোবরে প্রকল্প বাস্তবায়নের ঘোষণা আসে। পরে এটি আবার পরিবর্তন করে ২০২০ সালের মে-তে পেছানো হয়। কিন্তু এ তারিখও পুনরায় পরিবর্তন করে ২০২১ সালের ৩০ মার্চ উৎক্ষেপণের ঘোষণা দেওয়া হয়।

চিত্র: জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এর অভ্যন্তরীণ কাঠামো

কেন বারবার তারিখ পেছানো হচ্ছে? নিশ্চিত একটা তারিখ কেন স্থির করা সম্ভব হচ্ছে না? এখন পর্যন্ত পাঠানো সকল টেলিস্কোপের মধ্যে এই টেলিস্কোপ সবচেয়ে জটিল এবং আকৃতিতেও বড়। এতে যে সিলিকনের রক্ষা পর্দা (Sunshield) ব্যবহার করা হয়েছে তা একটি টেনিস-কোর্টের সমান।

দর্পণের আকৃতি বড় হওয়ায় এর প্রকৃত কাঠামোতে এটিকে মহাকাশে পাঠানো সম্ভব না। তাই বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপের দর্পণ, সিলিকনের পর্দাসহ অন্যান্য উপাদান বিভিন্ন কৌশলে রকেটে স্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন যেন উৎক্ষেপণের পর নির্ধারিত কক্ষপথে পৌঁছে নিজে নিজে তার কার্যকর আসল কাঠামো ধারণ করে। অনেকটা কাগজ ভাজ করার বিদ্যা অরিগামির মতো। ভাজে থাকলে ছোট কাঠামো কিন্তু ভাজ খুললেই তৈরি হয় মূল কাঠামো। কোনভাবেই যেন কোনো গণ্ডগোল না হয়, তার জন্য বিজ্ঞানীরা নিখুঁত পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন যার কারণে এর উৎক্ষেপণের তারিখ বারবার পেছানো হয়েছে। যদিও ২০১৬ সালে এটির নির্মাণকাজ শেষ বলে ঘোষণা দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। এখন আশা শুধু এতটুকুই- উৎক্ষেপণের তারিখ যাতে আর পেছানোর প্রয়োজন না হয় এবং সকল পরিকল্পনা যেন সফল হয়।

তথ্যসূত্র: নাসা, ফসবাইটস, স্পেস অ্যানসার

জেনেটিক ভাগ্য গণনা

মো: মাসরুর-উল আলম
ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, কুয়েট
facebook.com/prem.masrur

ভাগ্য শব্দটিকে মানুষের ধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে কয়েকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। কৌতূহলী মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই ভাগ্যকে আগেভাগে জানার চেষ্টা করে এসেছে। 'ভাগ্য গণনা' নামে চর্চার আলাদা একটি শাখাই গড়ে উঠেছে। সত্য হোক আর ভাওতাবাজি হোক, হাত দেখে মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দেবার ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীরা এরকম কিছুকে সবসময়ই নাকচ করে এসেছেন। এগুলোকে বাস্তবতাবিমুখ বিষয় হিসেবে অ্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞান নিজেই যদি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ্য গণনার কাজ শুরু করে তাহলে কেমন দেখাবে?

এই যেমন ধরুন—আপনাকে কোনো বিশেষ রোগে পাবে কি না, পেলে সেটা আনুমানিক কবে কিংবা আপনার দেহে এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে কি না, যা হতে পারে আপনার জীবননাশের কারণ। শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান আগাম বলতে পারবে এসব। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন—জেনেটিক ফরচ্যুন টেলিং। তবে হাত গণনার মতো কোনো বুজরুকি নয় এটি।

মানবদেহকে একটি বই হিসেবে কল্পনা করলে জিন হচ্ছে সে বইয়ের একেকটি অধ্যায়। প্রতিটি অধ্যায় মানবদেহের একেকটি বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। জীবদ্দশায় কোষগুলো

কেমন আচরণ করবে তাও নিয়ন্ত্রণ করে অধ্যায়গুলো। আর এই অধ্যায় তথা জিনকেই ভাগ্য বলার কাজে নিয়োজিত করতে চাইছেন বিজ্ঞানীরা। আর আগাম তথ্য থেকেই বিভিন্ন স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়ানোর জন্য ব্যবস্থা নিতে পারবে মানুষ।

ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হবে এমন কোষ আগে থেকেই শনাক্ত করা সম্ভব হবে। যেমন, ক্যান্সার বা অন্য কোনো রোগের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি অনেক আগে থেকেই বোঝার চেষ্টা করবেন তারা। ফলে দেহ স্বাভাবিক থাকা অবস্থাতেই অনেক জটিল জীবাণুর বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে। পুরো ব্যাপারটি বিজ্ঞানীরা জিনোম ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব করে তুলতে চান। এজন্যেই একে বলা হচ্ছে জেনেটিক ফরচ্যুন টেলিং। অর্থাৎ আপনার দেহের জিনগুলোই আপনার ভবিষ্যৎ বলে দেবে এবং প্রয়োজনে আগাম চিকিৎসা করে দেবে।

বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগ থেকে সতর্ক হওয়া যাবে আগে থেকেই।

এটি সফল হলে হার্টের সমস্যা, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, ডিপ্রেশনের মতো সমস্যার জন্য দেহ কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা বের করা যাবে ডিএনএ টেস্টিংয়ের মাধ্যমে। শুধু তা-ই নয়, এর মাধ্যমে আপনার এবং পরবর্তী প্রজন্ম কতটা বুদ্ধিদীপ্ত হবে সেটাও অনুমান করা যাবে।

কেন এমন ভাগ্য গণনা? বিগত বছরগুলোতে বিজ্ঞানীরা জিনোম নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন যে মানবদেহে রোগের মূলে সবসময় নির্দিষ্ট কিছু জিন কাজ করে। যেমন, জিন BCRA-1 এবং BCRA-2 এর মিউটেশন স্তন ক্যান্সার ও গর্ভাশয় ক্যান্সারের জন্য দায়ী। তাছাড়া দেহের জিনগুলো থেকে যে পরিমাণ তথ্য জানা যাবে তা আর কোনোভাবে জানা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান এই জিন প্রকৌশলের যুগে জিন টেস্ট করে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার বিষয়টি চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু।

এখন পর্যন্ত কতটুকু সফল এটি? জিনে বিদ্যমান তথ্যগুলো জেনেটিক ফরচ্যুন টেলিংয়ের মূল হাতিয়ার। বর্তমানের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ তথ্যগুলো ধরে রাখা সম্ভব। এই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয় 'জেনেটিক রিপোর্ট কার্ড'। সেই দিন খুব বেশি দূরে নয় যখন জন্মের পর পর বাবা-মার হাতে তুলে দেওয়া হবে সন্তানের ডিএনএ রিপোর্ট কার্ড।

এটি থেকে খুব সহজেই শিশুর ভবিষ্যতে ক্যান্সার, হার্ট অ্যাটাক কিংবা কোন ড্রাগে আসক্তির সম্ভাবনা কেমন তা নির্ণয় করা যাবে। বলা যাবে সে কেমন চরিত্রের অধিকারী হতে পারে বা কেমন হবে তার বুদ্ধিমত্তা। হয়তো সম্ভব হবে জিন মিউটেশনের মাধ্যমে তার দোষ দূর করে তাকে অনেক বেশি স্মার্ট হিসেবে গড়ে তোলা।

ভবিষ্যত সম্ভাবনা কেমন? নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যখাতের সম্ভাবনাময় এক প্রযুক্তি হতে পারে এই প্রযুক্তি। যেমন, এর মাধ্যমে এমনভাবে ওষুধ তৈরি করা যাবে যা সরাসরি রোগের একদম মূল জিনগুলোয় আঘাত হানতে পারবে। ওষুধকে অনেকটা কাস্টমাইজ করা যেন। এই ওষুধ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ঐ ব্যক্তির জিনের উপর কাজ করবে বিশেষভাবে। একে বলা হচ্ছে 'প্রেসিশন মেডিসিন বা পার্সোনালাইজড মেডিসিন'। উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালে ওবামা হোয়াইট হাউজ 'পার্সোনালাইজড মেডিসিন' এর উন্নয়নে ২১৫ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

এই প্রযুক্তির সাহায্যে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কেমন তা বের করা যাবে। আগেই ডিএনএ মিউটেশনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে। অগ্রগতিটাও হচ্ছে বেশ ভালোভাবে। হলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি এর বড় উদাহরণ। ক্যান্সারের ঝুঁকি থাকায় স্তন অপসারণ করিয়ে তিনি বেশ আলোচনায় এসেছিলেন।

চিত্র: অ্যাঞ্জেলিনা জোলি

তবে কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে এর। নৈতিকতার ব্যাপারটিও এক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। ধরুন, শিশুরা জন্ম হতেই পাবে রিপোর্ট কার্ড, যা বলে দেবে ভবিষ্যত সে কেমন মানুষ হতে পারে। আর তা সম্ভব হলে বৈষম্যের একটা বড় সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। বিজ্ঞানীরা একে অ্যাখ্যা দিচ্ছেন জেনেটিক বৈষম্য হিসেবে। যেখানে এক শিশু অন্য শিশুর চেয়ে ভালো সুযোগ পেতে পারে। এমনকি প্রশ্ন উঠতে পারে মমত্ববোধের ব্যাপারটিতেও।

আগে থেকে অনুমান করা আদৌ কতটুকু সঠিক হবে সেটাও একটা বিষয়। পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কেইবা আগে থেকে এত চিন্তার ভার নিতে চাইবে বলুন। এমনও তো হতে পারে যন্ত্রের কোনো গোলযোগ এর কারণে দেখা গেল একজনের ক্যান্সার ঝুঁকি নেই কিন্তু একটা সময় সে ঠিকই এ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ল। কাজেই একটা প্রযুক্তি হিসেবে এর কার্যকারিতা অনেকভাবেই প্রশ্নের মুখে। আবার নিখুঁত তথ্য জানা গেলে তা কীভাবে কোন কাজে ব্যবহার করা হবে, একজনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বা I.Q. জানা গেলে সেই তথ্য পিতা-মাতা বা শিক্ষক কীভাবে কাজে লাগাবে—এমন অনেক কিছুই প্রযুক্তিটির যথার্থ বিস্তারে কিছু বড় চ্যালেঞ্জ।

তবুও বিজ্ঞানীরা এর উন্নয়নের জন্যে নিরলস খেটে চলছেন। PubMed Database এর করা পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০০৭ সালে এ নিয়ে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র ছিল মাত্র ২৪০টি যা ২০১৭-তে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮০০টিতে। কাজেই এর ক্রমবর্ধমান প্রভাবই বলে দিচ্ছে এর অপার সম্ভাবনার কথা।

শিশুর জন্মের পরই পাওয়া যাবে জেনেটিক রিপোর্ট কার্ড

ডিএনএ ভিত্তিক প্রযুক্তিটি দোষ-গুণ মিলিয়ে এখন পর্যন্ত বেশ ভাল সূচনা করেছে। জিন প্রকৌশলের ডায়েরিতে যোগ করেছে নতুন এক মাত্রা। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, ডিএনএ'র ভবিষ্যদ্বাণী জীবনের যেকোনো সময়েই করা যাবে। আর তাই এর মার্কেটপ্লেস বানাতে সময় ও শ্রম দিয়ে যাচ্ছে হেলিক্স, মাইরিয়াড জেনেটিক্স, ব্রড ইন্সটিটিউট, ইউকে বায়োব্যাঙ্ক এর মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান।

জিনতত্ত্ববিদ এরিক টারখেইমারের মতে, *"জেনেটিক ডাটা ভাল-খারাপ উভয়ভাবে ব্যবহারের একটা সুযোগ রেখেই নতুন প্রযুক্তিটি ডানা মেলছে যা একইসাথে আকর্ষণীয় এবং ভীতিকরও বটে।"*

তথ্যসূত্র

1) https://outbreaktech.com/genetic-fortune-telling-technological-breakthrough-in-public-healthcare/
2) https://technologyreview.com/s/610251/forecasts-of-genetic-fate-just-got-a-lot-more-accurate/
3) https://vox.com/science-and-health/2018/8/23/17527708/genetics-genome-sequencing-gwas-polygenic-risk-score
4) https://vox.com/2014/9/4/18080676/genetic-testing-personalized-medicine

এক দশমিক এক মিলিয়ন পাউন্ড! হ্যাঁ, বিজ্ঞানীদের মতে, আকাশে ভেসে বেড়ানো পেঁজা তুলোর মতো মেঘেদের ওজন ১.১ মিলিয়ন পাউন্ড। এর মানে যেকোন একটা সময়ে, আপনার মাথার উপরে কয়েক লক্ষ কেজির পানি ধারণকারী মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে যা একশোটা হাতির ভজনের সমান। আর এই মেঘগুলো আমাদের মাথা থেকে বড়জোর এক হাজার মিটার উপরেও ভেসে বেড়াতে পারে।

হাসনাত বিন জুবায়ের

১০ মিনিটে ক্যানসার শনাক্তকরণ

মুহাম্মদ সামিউল আলম
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
facebook.com/samiulsakibdu

পৃথিবীর অন্যতম প্রধান মরণব্যধী হলো ক্যানসার। দেহের কোনো এক জায়গায় ক্যানসার হওয়ার পর তা ধীরে ধীরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৫ সাল নাগাদ প্রায় ৯০.৫ মিলিয়ন মানুষ ক্যানসার রোগে ভোগছে। প্রতিবছর প্রায় ১৪.১ মিলিয়ন মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয় এবং ক্যানসারের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৮.৮ মিলিয়ন। মানবদেহে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্যানসারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা উলেখযোগ্য হারে বাড়ে।

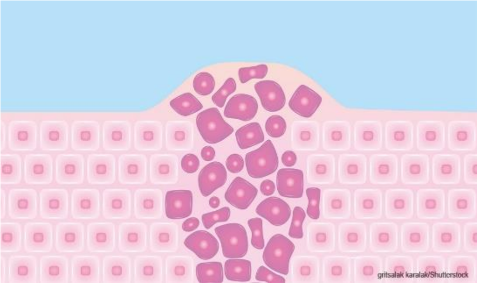

চিত্র: কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজনে জন্ম নেয় ক্যানসার।

কোনো রোগীর ক্যানসার হয়েছে কিনা এবং হলে সেটি কোন ধরনের ক্যানসার, তা বোঝার জন্য প্রথমে রোগীর দেহ থেকে নমুনা টিস্যুর বায়োপসি করে ডিএনএ সংগ্রহ করে তারপর পরীক্ষা করে দেখতে হয়। পুরো পদ্ধতিটি অনেক জটিল, ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আগে থেকে ক্যানসারের সম্ভাবনা বোঝা যাবে এমন কোনো টেস্ট নেই। তাই অনেক ক্ষেত্রে রোগীর ক্যানসার ধরা পড়ে এমন পর্যায়ে যখন তার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত।

প্রায় ১০ টি ক্যানসারঘটিত মৃত্যুর মাঝে ৯টির ক্ষেত্রেই দেখা যায় ক্যানসার ধরা পড়েছে অনেক দেরি করে। এমন একটা সময়ে এসে খবর হয় যখন আর কিছুই করার থাকে না। ক্যানসার হতে পারে দেহের যেকোনো অঙ্গে। আর একেক অঙ্গের ক্যানসার একেক রকম। এজন্য বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন ক্যানসারে ভিন্ন ভিন্ন টেস্ট করানো হয়।

এত ভিন্নতা ব্যাপারটিকে জটিল করে ফেলেছে। জটিলতা নিরসনের জন্য বিজ্ঞানীরা এমন একটি সার্বজনীন বায়োমার্কার খুঁজছিলেন যা সকল ক্যানসারের কমন (সাধারণ) বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সেটি রক্ত, মুখের লালা, মূত্রের মত শরীরের তরল পদার্থে পাওয়া যাবে।

চিত্র: গবেষণাগারে ড. আবু আলী ইবনে সিনা

সম্প্রতি এমনই একটি ডিএনএ ভিত্তিক বায়োমার্কার খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এর মাধ্যমে সহজ ও সাশ্রয়ী উপায়ে মাত্র ১০ মিনিটে সব ধরনের ক্যানসার শনাক্ত করা সম্ভব হবে। যুগান্তকারী এ প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ও গবেষক ড. আবু সিনা।

সফল এই গবেষণায় তার সাথে নেতৃত্বে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী ড. লরা কারাসকোসা এবং অধ্যাপক ম্যাট ট্রাউ। ক্যানসার শনাক্তে নতুন এবং কার্যকরী এ পদ্ধতির উদ্ভাবকরা অস্ট্রেলিয়ায় কুইন্সল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক।

তাদের গবেষণার বিশেষত্ব হচ্ছে উদ্ভাবিত টেস্টটি খুবই সহজ এবং মাত্র ১০ মিনিটে টেস্টটি একবার করার মাধ্যমে সকল প্রকার ক্যানসারের ক্ষেত্রে উপস্থিতি বলে দেওয়া সম্ভব। এই টেস্টের মাধ্যমে যদি আগে বুঝে ফেলা যায় শরীরে ক্যানসার বাসা বেঁধেছে কিনা তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে ন্যূনতম চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যানসারের দ্রুত ও সফল নিরাময় সম্ভব।

১০ মিনিটের এ টেস্টে প্রথমে মানুষের শরীর থেকে রক্ত কিংবা টিস্যুর নমুনা নিয়ে ডিএনএ আলাদা করতে হবে। এরপর ডিএনএ এর অতিক্ষুদ্র কণা গোল্ড ন্যানোপার্টিক্যালের সাথে মেশাতে হবে। মানুষের শরীরে যদি ক্যানসার থাকে তবে মিশ্রণের রঙ পরিবর্তন হবে না আর ক্যানসার না থাকলে মিশ্রণটি নীল রঙে পরিবর্তিত হবে।

ড. আবু সিনার অসামান্য এ আবিষ্কার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে ক্যানসার কীভাবে হয় এবং ক্যানসারের ফলে ডিএনএ তে সৃষ্ট পরিবর্তনসমূহ (বায়োমার্কার) কীরকম।

মূলত ৯০ – ৯৫ ভাগ ক্যানসার হয় পরিবেশগত কারণে আর বাকি ৫ – ১০ ভাগ হয় বংশগতীয় কারণে। পরিবেশগত কারণগুলোর মাঝে প্রধাণ হলো তামাক সেবন (২৫-৩০ ভাগ), স্থুলতা (৩০-৩৫ ভাগ), জীবাণু সংক্রমণ (১৫-২০ ভাগ), তেজস্ক্রিয় বিকিরণ (প্রায়

১০ ভাগ), দুশ্চিন্তা, দুষণ এবং কম শারীরিক শ্রম। ক্যানসার তখনই হয় যখন উপরোক্ত কারণগুলো কোষের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য দায়ী জিনের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

প্রকৃতপক্ষে জীবের সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য জিন দায়ী। প্রতিটি কোষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জিন সকল বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। মূলত জিন হলো ডিএনএ-র অংশ। এটি একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষের বার্তা বহন করে। এই প্রোটিনই কোষের বিভিন্ন কাজের মূল নিয়ন্ত্রক। একটা কোষ কী করবে, কীভাবে করবে, কখন বিভাজিত হবে সবকিছুই প্রোটিনের মাধ্যমে জিন নিয়ন্ত্রণ করে।

যদি কোনো কারণে (পরিবেশগত বা বংশগত) জিনের কোনো পরিবর্তন হয় তবে ভুল প্রোটিন সংশ্লেষ হতে পারে। এই ভুল প্রোটিন কোষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নষ্ট করে দিতে পারে। জিনের এ পরিবর্তন বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে। মাইটোসিস বিভাজনে ত্রুটির ফলে অতিরিক্ত ক্রোমোসোম সংযোজন কিংবা প্রয়োজনীয় ক্রোমোসোমের অপসারণের ফলে হতে পারে। সবচেয়ে বেশি যে পদ্ধতিতে জিন পরিবর্তন হয় তা হলো মিউটেশন। ডিএনএ অণুর নিউক্লিয়োটাইড সিকোয়েন্সে পরিবর্তনকেই মিউটেশন বলে।

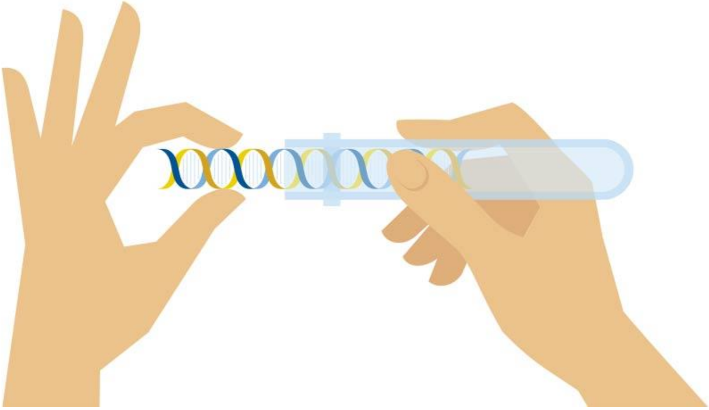

চিত্র: জীবের সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন।

মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকারক জিনগুলোকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অনকোজিন (Oncogene) যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিভাজন সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাভাবিক কোষকে ক্যানসার কোষে রূপান্তরিত করে। এছাড়াও আমাদের দেহে টিউমার নিয়ন্ত্রণের জন্য যে টিউমার দমনকারী জিন (Tumor Suppressor Gene) আছে তাতে মিউটেশনের ফলে অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন এবং টিউমারের সৃষ্টি হয়। যার চূড়ান্ত পর্যায় হলো ক্যানসার।

তবে কোষের সকল কাজ জিন নিয়ন্ত্রণ করলেও জিনের একজন বস (নিয়ন্ত্রক) আছে। তাকে বলা হয় এপিজিন। কোনো জীবের জীবদ্দশায় কোন্ জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে কিংবা কতটুকু প্রকাশ পাবে তা নির্ধারণ করে এপিজিন। এপিজিন নিয়ে বৈজ্ঞানিক পাঠের নাম হলো এপিজেনেটিক্স। আমাদের দেহে বিদ্যমান কোটি কোটি কোষের প্রতিটি কোষ একই রকম ও তাদের মাঝে একই পরিমাণ ডিএনএ বিদ্যমান। তবুও ত্বকের কোষ, চোখের কোষ, চুলের কোষ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণ হলো জিনের এপিজেনেটিক নিয়ন্ত্রণ।

যদি আমাদের জিনোম একটি প্যারাগ্রাফ হয় তবে এর মাঝে বিদ্যমান যতিচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা) হলো এপিজিন। যতিচিহ্নের পরিবর্তনের ফলে যেমন প্যারাগ্রাফের অর্থ পরিবর্তন হয় তেমনই এপিজিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে জিনের বহিঃপ্রকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। এপিজিনের দুটি প্রধান উপাদান হলো মিথাইল গ্রুপ এবং হিস্টোন প্রোটিন। কোনো জিনে একটি মিথাইল গ্রুপ যুক্ত হলে ঐ জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ বাঁধাগ্রস্ত হয় কিংবা বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে ডিএনএ মিথাইলেশন বলে।

অন্যদিকে হিস্টোন প্রোটিন নাটাইয়ের মতো ডিএনএকে কুণ্ডলী পাঁকিয়ে রাখে। হিস্টোন প্রোটিন ডিএনএকে যত বেশি আঁটসাঁটোভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখে জিন তত কম প্রকাশিত হয়। যত ঢিলেঢালাভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখে জিনের বৈশিষ্ট্য তত বেশি প্রকাশিত হয়। সহজভাবে বললে জিন যদি হার্ডওয়্যার হয় তবে এপিজিন হলো সফটওয়্যার। সফটওয়্যার যেমন হার্ডওয়্যার কখন কি কাজ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি কোন জিন কোন কোষে কখন, কতটুকু এবং কীভাবে প্রকাশিত হবে তার নিয়ন্ত্রক হলো এপিজিনোম। বয়সন্ধীকালে দাড়ি-গোঁফ গজানো কিংবা অন্যান্য শারীরিক পরিবর্তন কিন্তু এই এপিজেনেটিক্সেরই কারসাজি। এপিজেনেটিক পরিবর্তন হলো এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জিনের অভ্যন্তরীণ নিউক্লিয়োটাইড সিকোয়েন্স অপরিবর্তিত রেখেই জিনের বহিঃপ্রকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়।

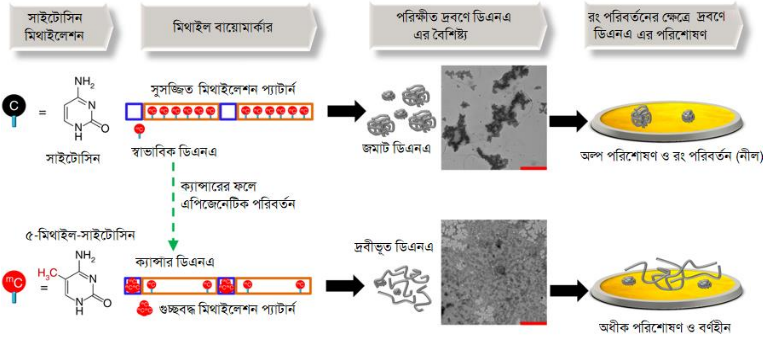

চিত্র: মিথাইলস্কেপের মাধ্যমে ক্যানসার ডিএনএ শনাক্তকরণ।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীবন মানের উপর ভিত্তি করে এপিজেনেটিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। যদি কোনো ক্ষেত্রে আমাদের ডিএনএ মেরামত জিনে এপিজেনেটিক পরিবর্তন হয় তখন এই জিন সঠিকভাবে প্রকাশ পেতে বাঁধাগ্রস্ত হয়ে এবং কোষ কার্যকরীভাবে ডিএনএ মেরামত করতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে ডিএনএ-তে নানা রকম ভুল মিউটেশন সৃষ্টি হতে থাকে যা একসময় ক্যানসার সৃষ্টি কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সকল ক্যানসারের ক্ষেত্রেই ডিএনএ-তে অনেক বেশি পরিমাণ এপিজেনেটিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তামাক সেবন, স্থূলতা, তেজস্ক্রিয়তা, খাদ্যাভ্যাস সহ আরও অনেক পরিবেশগত কারণে এই এপিজেনেটিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। সকল ক্যানসারেই এরূপ এইজেনেটিক পরিবরর্তন ঘটে বলে ড. আবু সিনা এবং তার দল ক্যানসার শনাক্তকরণ এই এপিজিনেটিক মার্কার ব্যবহার করছেন। আর এই মার্কার ব্যবহার করে ক্যানসার শনাক্ত করতে সময় লাগবে মাত্র ১০ মিনিট।

কীভাবে কাজ করে ১০ মিনিটের এ টেস্ট? মানবদেহের সকল কোষে একই ডিএনএ বিদ্যমান। কিন্তু ক্যানসার সৃষ্টি হলে কোষের ডিএনএ-তে উল্লখযোগ্য পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন আসে ডিএনএ তে বিদ্যমান মিথাইল গ্রুপের বিন্যাসে। সাধারণ কোষের ডিএনএ-তে থাকা মিথাইল গ্রুপ একরকম বিন্দু বিন্দু প্যাটার্ন তৈরি করে সুসজ্জিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু যেসব কোষে ক্যানসার হয়েছে, সেসব কোষের ডিএনএ-তে বেশিরভাগ অংশ জুড়ে গুচ্ছবদ্ধ মিথাইল গ্রুপ দেখা যায়। এরা স্বাভাবিক কোষের মতো ক্রমিক সজ্জা মেনে চলে না। এই বৈশিষ্ট্যকে মিথাইলস্কেপ বলে। বিজ্ঞানীরা মিথাইলস্কেপকে বায়োমার্কার হিসেবে ব্যবহার করলেন।

কোষের ডিএনএ-তে মিথাইলস্কেপ আছে কিনা জানতে পারলেই উনারা বলতে পারবেন কোষটি ক্যানসার আক্রান্ত কিনা। তরল দ্রবণে সুস্থ কোষের ডিএনএ অধিক জমাট বাঁধলেও ক্যানসার কোষের ডিএনএ জমাট বাঁধে না। এই জামাট বাঁধা অবস্থা নির্দেশনের জন্য গবেষকরা দ্রবণে গোল্ড ন্যানোপার্টিক্যাল ব্যবহার করেন। সুস্থ কোষের ডিএনএ সহ দ্রবণে গোল্ড ন্যানোপার্টিক্যাল মেশানোর পর লবণ যোগ করলে দ্রবণ গোলাপী থেকে নীল রঙ ধারণ করে কিন্তু ক্যানসার কোষের ডিএনএ ও স্বর্ণ মেশানো দ্রবণে লবণ যোগ করলে দ্রবণের রঙে কোন পরিবর্তন হয় না। এই পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষকরা কোন জটিল বা ব্যবয়বহুল পদ্ধতি ছাড়াই মাত্র কয়েক মিনিটে রোগীর যেকোণ ডিএনএ নমুনা থেকে ক্যানসারের উপস্থিতি শনাক্ত করতে পারেন।

চিত্র: রক্ত পরীক্ষা করে মাত্র ১০ মিনিটেই শনাক্ত করা যাবে ক্যানসার।

এখন পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে ২০০ ক্যানসার রোগীর নমুনা নিয়ে কাজ করা হয়েছে এবং সেখান থেকে ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই শনাক্ত করার পরীক্ষাটি সফল। সার্বজনীন ক্যানসার বায়োমার্কারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে সব ধরনের ক্যানসার শনাক্ত করা যাবে এমন প্রযুক্তির বিবরণ সম্পর্কে বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল *নেচার কমিউনিকেশন্স*-এ।

এই গবেষণাকাজের নেতৃত্বে থাকা তিনজনের একজন বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. আবু সিনা। বাংলাদেশি এই বিজ্ঞানী *Development of point of care technology for the*

detection of cancer biomarkers নামের ক্যানসার শনাক্তকরণ প্রজেক্টের একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমিস্ট্রি এবং মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের সাবেক শিক্ষক।

ড. আবু সিনা পড়াশোনা করেছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তিনি উচ্চতর গবেষণা ও পিএইচডি করতে কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট ফর বায়োইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বৃত্তি নিয়ে ভর্তি হন তিনি। এখানে ন্যানো টেকনোলোজি থেকে বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করে রিসার্চ ফেলো হিসেবে ক্যানসার নিয়ে গবেষণা করছেন।

যদিও খালি চোখে এত সহজে ক্যানসার শনাক্ত করাটা ক্যানসারের চিকিৎসা প্রক্রিয়াকে বেশ সহজ করে দেবে, তবু গবেষকরা মনে করছেন, এখনও পুরো ব্যাপারটিতে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা বাকি আছে। সব পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ট্রায়াল শেষে সকলের জন্য ব্যবহার উপযোগী একটি চিকিৎসাপ্রযুক্তি হয়তো আমরা শীঘ্রই পাবো, এমনই প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

তথসূত্র

1. weforum.org/agenda/2018/12/one-test-to-diagnose-them-all-researchers-exploit-cancers-unique-dna-signature
2. nature.com/articles/s41467-018-07214-w

জিরো টু ইনফিনিটির ফেসবুক পেজঃ facebook.com/bn.z2i
জিরো টু ইনফিনিটির ফেসবুক গ্রুপঃ facebook.com/groups/zero2inf

তাপগতিবিদ্যার দৃষ্টিতে পাখির পরিযান

শাহরিয়ার কবির পাভেল
বিভাগীয় সম্পাদক, জিরো টু ইনফিনিটি
facebook.com/skpavel.pi

প্রতিবছর একদল সাদা পাখি পাড়ি দেয় দীর্ঘ পথ—গ্রিনল্যান্ড থেকে অ্যান্টার্কটিকা। সোজা পথ নয়, বহু দেশ ঘুরে এঁকেবেঁকে তবে গন্তব্যে পৌঁছে। এরা পরিচিতি আর্কটিক টার্ন নামে। শুধু তা-ই নয়, একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে সে পথ ধরেই ফিরে আসে আগের ঠিকানায়। প্রায় ৪৪ হাজার মাইল পথ ডানার ওপর ভর করে পাড়ি দেওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়।

এ প্রজাতির একেকটা পাখি জীবদ্দশায় যে পরিমাণ পথ পাড়ি দেয়, তা শুনলে চোখ কপালে উঠে যাবে; পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব যত তার প্রায় তিন থেকে চারগুণ পথ। আবার উত্তর আমেরিকার পার্বত্য এলাকার ধূসর বুনো হাঁসের জীবনধারা ঠিক উল্টো। এরা কোনোমতে মাইলখানেক ওড়াউড়ি করে, তাও কেবল প্রজনন স্থান ও নিয়মিত বাসস্থানের মধ্যে। সত্যি বলতে কি—অধিকাংশ পাখিই ভ্রমণপাগল নয়।

গত বছর (২০১৮) *নেচার ইকোলজি অ্যান্ড ইভোলিউশন* গবেষণা সাময়িকীতে পাখিদের নিয়ে একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়। গবেষণার বিষয় পরিযান আর পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে থাকা পাখিদের প্রজাতির বণ্টন—এ দুইয়ের তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে প্রজাতিরা কীভাবে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে বেঁচে থাকবে। এ গবেষণাপত্রের জোর দাবি, প্রাকৃতিক শক্তির জোগান আর চাহিদাই বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্যের বাস্তুসংস্থানকে পরিচালনা করছে।

১৮০৭ সালের কথা। জার্মান প্রকৃতিবিদ আলেক্সান্ডার ভন হামভল্ড বললেন, ক্রান্তীয় অঞ্চলের যত কাছাকাছি এলাকা বিবেচনা করা হবে জীববৈচিত্র্যের গঠন, ধরন, রঙের মিশ্রণ, তারুণ্যের সমাহার ততই স্পষ্ট হবে। বিষুবরেখা থেকে ২৩.৫° করে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকে ক্রান্তীয় অঞ্চল বিস্তৃত। উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির বৈচিত্র্য যে মেরু থেকে বিষুবরেখার দিকে ক্রমেই বর্ধনশীল—এ মতবাদের প্রথম সারির লোকদের একজন ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও পাখিদের ওপর করা দু'শতকের পর্যবেক্ষণেও যেন বিজ্ঞানীদের কাছে বৈচিত্র্যের প্যাটার্ন ধরা দিচ্ছিল না।

বহু হাইপোথিসিস প্রস্তাব করা হয়েছে এ দীর্ঘ সময়ে। একদল বলল, ক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রাণীরা পেয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে অভিযোজনের সুযোগ। এই দীর্ঘ সময়ে বিবর্তনীয় স্থিতিশীলতার ফলে বহু প্রজাতি বসতির সুযোগ পেয়েছে। বিপরীত দিকে, কয়েক দফা বরফযুগের ফলে মেরুতে বরফের সমৃদ্ধি ঐ অঞ্চলের প্রজাতিদের জন্য বিলুপ্তির কারণ ছিল।

আরেক দল মনে করে, বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে উষ্ণতর তাপমাত্রা প্রজাতির বৈচিত্র্যের জন্য ইতিবাচক ছিল। এমন যত হাইপোথিসিসই প্রস্তাবিত হয়েছে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল বৈশ্বিকভাবে ওই হাইপোথিসিস কাজ না করা। গবেষকদের হয় নির্দিষ্ট কিছু প্রজাতি ধরে বলতে হতো নয়তো বিশেষ কোনো অঞ্চলকে বিবেচনা করতে হতো। আর দেখা যেত বড় পরিসরের কথা আসলেই হাইপোথিসিসের দাবি নড়চড় হচ্ছে।

এ গবেষণাপত্রের লেখক মরিয়াস সামভেইল এবং তার সহকর্মীরা পাখি পরিযানের তথ্য নিয়ে কম্পিউটার সিমুলেশন পরিচালনা করলেন। সিমুলেশন হলো বাস্তবিক কোনো ঘটনার অনুকরণে কম্পিউটারে করা মডেল। এ জন্য পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত ১০ হাজার পাখির পরিযানের প্রামাণ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হল। তা সে প্রজাতি সুলভই হোক বা বিলুপ্তপ্রায়ই হোক, শীত আর গ্রীষ্মে নির্দিষ্ট অঞ্চল ধরে সবার আসা-যাওয়ার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হল।

পরিযানের প্যাটার্নগুলো কীভাবে কাজ করছে তা বুঝতেই আসলে গবেষকদের যান্ত্রিক মডেলের প্রয়োজন ছিল। নতুন এ সিমুলেশন মডেলে পৃথিবীর অনুরূপ ভার্সন সাজানো হল, এর একেক মহাদেশ, ঋতু এবং আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের তথ্য দিয়ে তৈরি হল ভার্চুয়াল পৃথিবী। এরপর একে একে পাখিদের প্রজাতি সেই মডেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিমুলেশনেও অবশ্য প্রজাতির বৈশিষ্ট্য প্রণয়নে বাস্তব পরিসংখ্যান ও উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

এ ভার্চুয়াল পৃথিবীর ক্ষেত্রে পাখিদের লক্ষ্য ঠিক করে দেয়া হয়েছিল যেন, প্রতি প্রজাতির সর্বাধিক লাভজনক পরিবেশ বেছে নেয়। কোনো পাখি তখনই পরিযান করবে, যদি পরিযানের ফলে লাভজনক পরিবেশ পায়। যখনই কোনো নতুন প্রজাতি এ ভার্চুয়াল জগতে যুক্ত করা হয়, তখন এর জন্য বহু সুযোগ থাকে।

হতে পারে, সে পাখি ব্রাজিলে শীত কাটাবে আর গ্রীষ্মে চলে যাবে যুক্তরাষ্ট্রে অথবা ব্রাজিলে গ্রীষ্ম, যুক্তরাষ্ট্রে শীত অথবা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র—পুরো বছর যুক্তরাষ্ট্রে বা পুরো বছর ব্রাজিলে, এমনি করে এই দুটো অঞ্চলের জায়গায় আরো অঞ্চলাদির সুযোগ এলে বেশ এক দফা গণিতের প্রয়োজন। এভাবে প্রতিটি প্রজাতি একেকটি পরিবেশ বেছে নেবে যেটি সবচেয়ে উপযোগী হবে। এ উপযোগিতা নির্ভর করবে মেটাবলিজম (বিপাক), প্রজনন, তাপীয় ব্যবস্থা এবং পরিযান—এই চার বিষয়ের উপর।

মৌসুম পরিবর্তনের সাপেক্ষে পাখিদের সাংখ্যিক পরিবর্তন

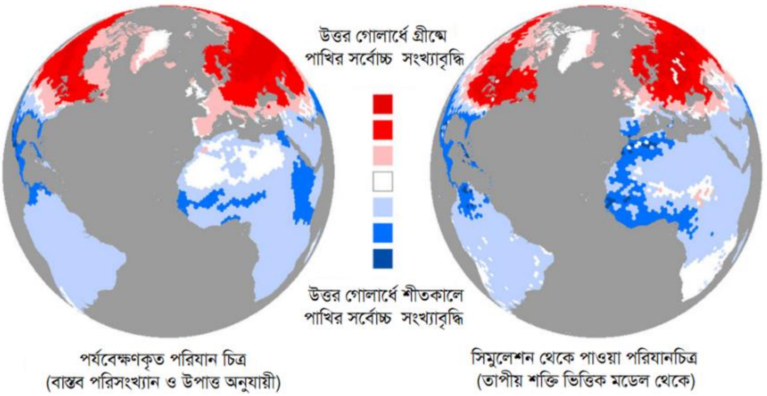

পাখি পরিযানের আঞ্চলিক অনুপাত

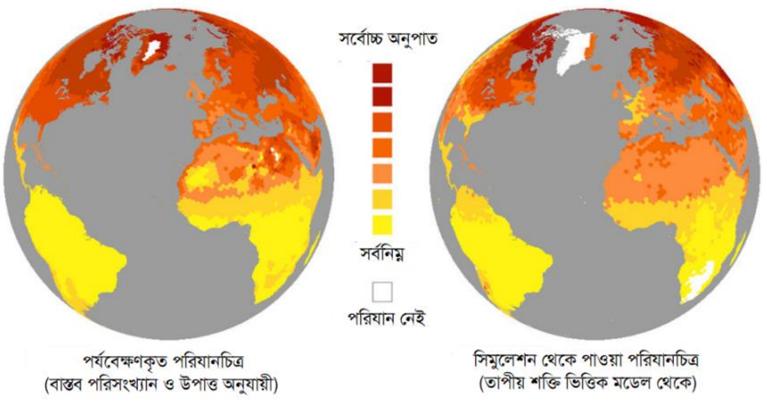

এ শর্তগুলোকে ভিত্তি ধরে গবেষকেরা চালু করে দিলেন তাদের সিমুলেশন। আশাতীতভাবেই, প্রথম দিককার ভার্চুয়াল পাখিরা ক্রান্তীয় অঞ্চলে বছরজুড়ে থাকল। কারণ, উষ্ণতার জন্য বাড়তি শক্তি খরচ করার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ক্রমেই যখন সংখ্যা বাড়তে থাকল, ক্রান্তীয় অঞ্চলে থাকা আর তখন আদর্শ কৌশল রইল না, অল্প জায়গায়

জনসংখ্যা বেড়ে গেলে যা হয়। প্রতিযোগিতা কমাতে তাই কিছু প্রজাতি মৌসুমিভাবে ভ্রমণ করে এলাকা পরিবর্তন করল।

এভাবে সব প্রজাতি যখন এ ভার্চুয়াল পৃথিবীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে গেল তাদের চূড়ান্ত বণ্টন ও বর্তমানের বাস্তব বণ্টনের চিত্রে অভূতপূর্ব মিল পাওয়া গেল। সবচেয়ে আশাজনক ব্যাপার হলো, এই মডেল খুব সূক্ষ্মভাবে পাখিদের আচরণ অনুমান করতে পেরেছে, যা অতীতের যেকোনো হাইপোথিসিসের তুলনায় এগিয়ে। বছরে কোথাও কোথাও আসা–যাওয়া পাখিদের সংখ্যাও মিলে গেছে বাস্তব উপাত্তের সঙ্গে।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য উল্লেখ করেছেন, যে ক্রম ধরে একের পর এক প্রজাতিদের যুক্ত করা হয়েছে, তা পাখিদের বিবর্তনীয় ইতিহাসের ক্রমের সঙ্গে এক নয়। কারণ হিসেবে তারা দেখিয়েছেন, উষ্ণতা, শক্তির প্রাপ্যতা নিয়ামক হিসেবে বড় প্রভাব বিস্তার করে। ফলে ধাপে ধাপে পাওয়া মৌসুমি বণ্টন আগে-পরে করে পাখিদের উদ্ভবের ইতিহাস অনুযায়ী সিমুলেশনে যোগ করলেও বর্তমান চিত্রে খুব একটা পার্থক্য হত না।

যেকোনো মডেল দাঁড় করাতে সরলীকরণের ব্যাপার চলে আসে। এ কারণে কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতাও থেকে যায় মডেলের, তেমনি এ মডেলেও রয়েছে। এই ভার্চুয়াল সিমুলেশনে পাখিদের সংখ্যা বাস্তবের চেয়ে আনুপাতিক হারে কম ছিল। অল্প কিছু অঞ্চলের পরিযান চিত্র যথেষ্ট সঠিকও হয়নি, বিশেষ করে পর্বতময় এলাকা, যেমন আন্দিজ এবং হিমালয়। এসব এলাকার ভূতত্ত্ব, ধরন, ক্রমবিকাশ ইত্যাদি বিষয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে প্রজাতির বৈচিত্র্যে।

তাই মোটের উপরে বৈশ্বিক স্কেলে, পরিযানের বৈশ্বিক চেহারার কারণ হিসেবে শক্তি দক্ষতাই পাখিদের বিশ্বব্যাপী বণ্টনের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যখন নির্দিষ্ট অঞ্চল বা প্রজাতির উপদলকে নিয়ে কাজ করা হবে, তখন স্থানীয় অন্যান্য নিয়ামকও হিসেবে রাখতে হতে পারে। এ ছাড়া পাখিরা যদিও তাদের উপযুক্ত সমাধান বাছাই করতে পেরেছে, তবে এ সমাধান বাছাই কীভাবে সম্ভব হলো তার বিস্তারিত উপায় এ সিমুলেশন ব্যাখ্যা করতে পারে না।

বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, জলাশয় ভরাট আর মানুষের নানা কর্মকাণ্ড বাড়ায় ইউরোপে সাদা সারসের একাংশ জনসংখ্যাকে দেখা গেছে তাদের ভ্রমণ পথ ছোট করে ফেলতে। শীতের সময় আগের মতো তাপমাত্রা কমে যায় না বলে এরা দূরে পরিযান করছে না। এছাড়া বছরজুড়ে মানুষের ফেলা আবর্জনা থেকে খাবার সংগ্রহ করতে পারছে।

গবেষকরা তাদের এ মডেল অতীত ও ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি পেতেও পরীক্ষা করে দেখতে চান। জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে, কৃষিব্যবস্থার সূচনা, নগরায়নের আবির্ভাব কীভাবে পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা দেখা সম্ভব হবে। এই গবেষণা যে কেবল পাখিদের জন্যই প্রযোজ্য হবে, তা–ই নয়। সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী, মাছ, পোকামাকড় এবং অন্যান্য বহু প্রাণীই আছে যাদের জীবনচক্রের অংশ এই পরিযান। এ গবেষণাপত্রের এক সহলেখক তো বলেছেন, 'যা–ই চলাফেরা করতে পারে, তারই কোনো এক মাত্রার পরিযান রয়েছে।' মনে হয় গবেষকদের হাত থেকে কারো রেহাই নেই!

মূল লেখা: A Thermodynamic Answer to Why Birds Migrate | Quanta Magazine

জীববজগৎ

চ্যাপ্টা কৃমির অতীত জন্মের স্মৃতি

রাইয়ান আল ইসলাম রেশাদ

পুনর্জন্ম কিংবা পূর্ব জন্মের স্মৃতি বলা—এ ব্যাপারগুলো মানুষের মধ্যে নানা তর্ক বিতর্ক কিংবা কল্পনা-জল্পনার সৃষ্টি করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এ মিথ কিন্তু flat worm বা চ্যাপ্টা কৃমির বেলায় সত্য!

পূর্বজন্মের স্মৃতি ব্যাপার কি আদৌ সত্য? জিজ্ঞাসু মনের এ জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে কাজ করেছে Tuft University-র একদল গবেষক। তারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন চ্যাপ্টা কৃমি তাদের অতীত জীবনের স্মৃতি ধরে রাখতে পারে তাদের নিউরন কোষে। গবেষকরা planarian নামে একধরনের চ্যাপ্টা কৃমি নিয়ে তাদের পরীক্ষা করেছেন।

সাধারণত এ প্রজাতির কৃমি স্যাঁতস্যাঁতে, কম আলো ও বদ্ধ পরিবেশে থাকতে ও সেখান থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কিন্তু, বিজ্ঞানীরা কিছু চ্যাপ্টা কৃমিকে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে উজ্জ্বল আলোকিত স্থানে খাপ খাওয়াতে পেরেছেন।

পরবর্তীতে দেখা যায়, ঐ কৃমিগুলো উজ্জ্বল স্থানে বসবাস করতে এবং সেখান থেকে খাদ্যগ্রহণে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে। এ অবস্থায় ঐ কৃমিগুলোর প্রত্যেকটিকে ২৭৯টি খণ্ডে বিভক্ত করে ঐ খণ্ডগুলোটিকে পেট্রিডিশে রাখা হয়।

এরপরই ঘটলো চমকপ্রদ ঘটনা—কৃমিদের ঐ খণ্ডগুলো ডিশের সবচেয়ে আলোকিত অংশের মধ্যভাগে বাস করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে শুরু করলো। আর সেখান থেকেই খাদ্যগ্রহণ শুরু করল তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ভুলে গিয়ে।

তাহলে কি গবেষকদের দেয়া প্রশিক্ষণ এবং তাদের উজ্জ্বল আলোয় খাপ খাওয়ার স্মৃতি নতুনভাবে উদ্ভূত নিউরন কোষে ধরে রেখেছে? তাহলে চ্যাপ্টা কৃমি কি নিউরন কোষ বাদে অন্য কোথাও স্মৃতি সংরক্ষণ করে? এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কীসের হাতছানি দেখা দিচ্ছে? এ পরীক্ষার ভিত্তিতে স্মৃতিশক্তি হারানো মানুষের স্মৃতি ফেরানোর সম্ভাব্যতার চিন্তা কি বিলাসিতা? দেখা যাক, এতগুলো প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞান নামক লাগামহীন ঘোড়া কোথায় গিয়ে পৌঁছে। সময়ই বলে দেবে উত্তর।

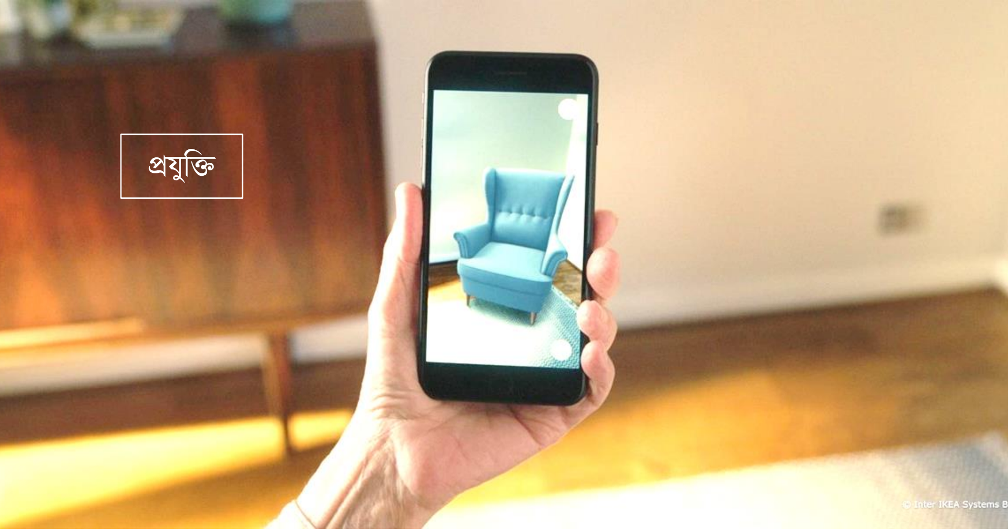

অগমেন্টেড রিয়্যালিটির জগতে

শাহ্‌রিয়ার কিবরিয়া
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, শাবিপ্রবি
facebook.com/priyo206

Augmented Reality—আপনি যদি এর সাথে পরিচিত না থাকেন, তাহলে নিশ্চিত থাকুন কিছুদিন বাদেই এর সাথে পরিচিত হবেন। Augment শব্দটির অর্থ বৃদ্ধি করা বা যোগ করা। সহজ ভাষায় বলতে গেলে স্বাভাবিক জিনিস তথা রিয়্যালিটির সাথে যদি বাইরে থেকে কোনো উপাদান যোগ করা হয়, তাকে বলা যাবে অগমেন্টেড রিয়্যালিটি। বাইরে থেকে যোগ করা সেই উপাদানটির বাস্তব কোনো রূপ নেই। সেটি বস্তুগত নয়, স্পর্শ করা যায় না।

আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আপনার ইচ্ছে হলো রাস্তায় গাড়ি দেখার। কিন্তু ইচ্ছে হলে তো আর বাস্তবে মনমতো গাড়ি দেখা যাবে না। তখন আপনি আশ্রয় নেবেন অগমেন্টেড রিয়্যালিটি প্রযুক্তির। এর মাধ্যমে রাস্তায় একটি অবাস্তব গাড়ি দেখতে পাবেন। আর এ কাজটি করতে পারবেন খুব সহজে স্মার্টফোনের একটি অ্যাপের মাধ্যমেই। বর্তমানে দশটিরও বেশি অ্যাপ আছে এই প্রযুক্তিটি উপভোগ করার জন্য। সোশ্যাল মিডিয়া ফিল্টার থেকে শুরু করে সার্জিক্যাল প্রসিডিউর, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগমেন্টেড রিয়্যালিটির খ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাস্তব জগতে অবাস্তব উপাদান যোগ করার ফিচার আছে বলে এটি দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। অগমেন্টেড রিয়্যালিটির সঠিক বাংলা করা দুরূহ। তবে আপাতত একে উদ্দীপিত বাস্তবতা বলার ইচ্ছে পোষণ করছি। এটি আমাদের প্রকৃত বাস্তবতা এবং ভার্চুয়াল বাস্তবতার মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে বলা যায়।

অগমেন্টেড রিয়্যালিটিকে যদি সংজ্ঞায়িত করতে চাই, তাহলে বলতে হয় যে, এটি আমাদের স্বাভাবিক বাস্তবতার একটি উন্নত সংস্করণ। এখানে বিশেষ উপায়ে তৈরি আলোকচিত্র যোগ করে নতুন মাত্রা দেওয়া হয়। শুধু চিত্রই যে যোগ হয় তা না, এর সাথে শব্দও যোগ হয়। শুধু চোখ নয়, কানও এই বাস্তবতা উপভোগ করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে হাতে স্পর্শ করে বিভিন্ন রকম চিত্রও আঁকাও যায়। রেখাও টানা যায়।

কোনো কোনো মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে রুমের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করা যায়। ত্রিমাত্রিক বস্তুর আয়তনও বের করা যায়। এই প্রযুক্তি শুধু বিনোদনেরই উৎস নয়, বরং অনেক হিসাব-নিকাশও করা সম্ভব এর মাধ্যমে।

ভার্চুয়াল বাস্তবতার সাথে অগমেন্টেড বাস্তবতার পার্থক্য হচ্ছে যে, ভার্চুয়াল বাস্তবতায় আপনি পুরোপুরি অবাস্তব একটি জগত দেখতে পাবেন। এখানের পুরোটাই একটি অন্য বাস্তবতা। আমাদের স্বাভাবিক বাস্তবতার সাথে এর কোনো মিল নেই। এটা দেখার জন্য আপনাকে ভিআর বক্স ব্যবহার করতে হবে। ফলে বাস্তবে কী হচ্ছে আপনি কিছুই টের পাবেন না। আপনি শুধু ভার্চুয়াল জগতটাই অনুভব করবেন।

চিত্র: ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি দেখতে হলে দরকার ভিআর বক্স।

অন্যদিকে অগমেন্টেড বাস্তবতায় প্রকৃত বাস্তবতার সাথে অবাস্তব কিছু উপাদান যোগ হবে। বাস্তবে কী হচ্ছে সেটা সহজেই অনুধাবন পারবেন। এটিতে একইসাথে প্রকৃত বাস্তবতা এবং ভার্চুয়াল বাস্তবতায় বিচরণ করতে পারবেন।

বর্তমানে উদ্দীপিত বাস্তবতার চারটি প্রকারভেদ আছে। মার্কার বেজড, মার্কারলেস, প্রজেকশন বেজড এবং সুপার ইম্পোজিশন বেজড।

মার্কার বেজড অগমেন্টেড রিয়্যালিটিকে ইমেজ রিকগনিশনও বলা হয়। ক্যামেরা এবং কিছু ভিজুয়াল মার্কার (যেমন কিউ আর কোড, টুডি কোড) ব্যবহার করে অগমেন্টেড বাস্তবতা তৈরি করা হয়। মার্কারগুলোকে যখন সেন্সর খুঁজে পায়, তখন মেশিন সেটাকে বাস্তবতা থেকে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং অবাস্তব উপাদান যোগ করে।

মার্কার বেজড

মার্কারলেস রিয়্যালিটিকে পজিশন বেজড বা লোকেশন বেজড রিয়্যালিটিও বলা হয়। এই পদ্ধতিতে জিপিএস ব্যবহার করা হয়। স্মার্টফোনের লোকেশন ফিচার ব্যবহার করে লোকেশন অনুসারে তৈরি করে দেখায় অগমেন্টেড বাস্তবতা। ড্রাইভিংয়ে সুবিধা পেতে, ম্যাপের দিকনির্দেশনা পেতে, কাছাকাছি দরকারি কোনো জায়গায় যেতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

মার্কারলেস

বাস্তব জগতের কোনো তলের উপর কৃত্রিম আলো ফেলে তৈরি করা বাস্তবতাকে বলা হয় প্রজেকশন বেজড বাস্তবতা। লেজার প্লাজমা টেকনোলজি ব্যবহার করে থ্রিডি হলোগ্রাম তৈরি করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

প্রজেকশন বেজড

সুপারপজিশন বেজড বাস্তবতায় কোনো বস্তুকে সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিবর্তন করে ফেলা হয়। ফলে বস্তুটিকে সম্পূর্ণ নতুন রূপে ও নতুন আঙ্গিকে দেখা যায়। ডিজাইনিং কিংবা ফার্নিচারে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

সুপারপজিশন বেজড

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কীভাবে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করব? স্মার্টফোনের মাধ্যমেই এটি ব্যবহার করা যাবে। তাছাড়া কিছু বিশেষ এআর (AR = Augmented Reality) ডিভাইসও ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন হেড-আপ ডিসপ্লে (HUD)। ব্যবহার করতে পারেন এআর গ্লাস বা স্মার্ট গ্লাস। গুগল গ্লাস, মেটা টু গ্লাস, ল্যাস্টার সি গ্রু, লাফোর্জ এআর আই ওয়ার ইত্যাদিও আছে। এগুলো ছাড়াও আছে এআর কনট্যাক্ট লেন্স বা স্মার্ট লেন্স। সনি ও স্যামসাং শীঘ্রই স্মার্ট

চিত্র: অগমেন্টেড রিয়্যালিটি ব্যবহার করে ফ্রান্সে হয়েছিল একটি আর্ট এক্সিবিশন।

লেন্স বাজারে আনবে। এগুলোর মাধ্যমেও আপনি অগমেন্টেড বাস্তবতা উপভোগ করতে পারবেন।

২০১৯ এর মার্চে দুজন ফরাসী চিত্রকর একটি আর্ট এক্সিবিশন করেন। সেখানে খুব চমকারভাবে তারা অগমেন্টেড রিয়্যালিটির ব্যবহার করেন। শিল্প-সাহিত্য জগতে দারুণ এক সম্ভাবনা হতে পারে এই প্রযুক্তি। ইন্টারনেটে খুঁজলে এই এক্সিবিশনটির বিভিন্ন আলোকচিত্র ও ভিডিও পাওয়া যাবে। ভবিষ্যৎই বলবে কেমন হবে আমাদের ভবিষ্যতের বাস্তবতার রূপ।

কীভাবে কাজ করে এই প্রযুক্তি? সেটি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিয়ে আরেকদিন লিখব। আশা করি কিছুটা হলেও আপনাদের নতুন তথ্য জানাতে পেরেছি। আজ এতটুকুই। আপনার হাতে যদি স্মার্টফোন থাকে, তাহলে আপনি উদ্দীপিত বাস্তবতার স্বাদ নিতে পারেন এখনই।

তথ্যসূত্র

1) https://realitytechnologies.com/augmented-reality
2) https://thinkmobiles.com/blog/augmented-reality-furniture/

এক মহাজাগতিক দুর্ঘটনা

আশির দশকের কথা। নাসার স্পেস শাটল প্রোগ্রাম তখন মামুলি ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। জনসাধারণের শাটল নিয়ে আগ্রহ অনেকখানি কমে গিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকান কংগ্রেসের কাছে শাটল টিকিয়ে রাখার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট পেতে জনগণের সমর্থন খুব দরকার ছিল। তাই নাসা প্রথমবারের মতো স্পেস স্টেশনে কিছু বাচ্চাদের পড়ালেখা করানো হবে বলে ঠিক করে। এবং সেটা সারা পৃথিবীতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

স্পেস শাটল চ্যালেঞ্জার ৭ জনকে মহাকাশে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু লঞ্চিংয়ের আগের দিন ফ্লোরিডার তাপমাত্রা মাইনাস ৬ ডিগ্রিতে নেমে আসে। এতে স্পেস শাটলটির উড্ডয়ন নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। আশঙ্কা দেখা যায় যে, শাটলটির সলিড রকেট বুস্টার অনেক তাড়াতাড়ি জ্বালানী পুড়িয়ে একটা বোমায় পরিণত হবে। নাসার সব ইঞ্জিনিয়ার শাটলটিকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও সব রকমের ব্যবস্থা নিলেন। পরদিনই শাটলটিকে ওড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

লঞ্চিং প্যাডের কাছে সেদিন উপস্থিত হয়েছিল প্রচুর জনগণ। ১৯৮৬ সালের ২৮ই জানুয়ারি। নির্দিষ্ট সময়ে চ্যালেঞ্জারের ২৫ তম উড্ডয়ন শুরু হয়। ফ্লোরিডা থেকে ২ কি.মি উচ্চতায় উঠার পর বোঝা যায় যে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। উড্ডয়নের ৭৩ সেকেন্ড পর কিছু ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগেই বুম! সবার চোখের সামনে শাটলটি বিরাট একটা বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়। সবাই হতবাক চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং হয়তোবা ভাবছিল, এটা কি হলো? মহাকাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে গিয়ে মহাকাশ বীর হয়ে তাদের নিহত হতে হলো।

এই ঘটনার পর স্পেস শাটলের আর কোনোদিন উড্ডয়ন হবে কিনা তা ছিল অনিশ্চিত। কিন্তু সব বাধা পেরিয়ে স্পেস শাটল আরো অনেকদিন অনেক মিশন সম্পন্ন করেছে। কিন্তু চ্যালেঞ্জার দুর্ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিল যে নভোচারীরা কতোটা ঝুঁকি নিয়ে মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে অটল থাকেন।

বিস্ফোরণের সেই ভিডিওটি দেখুন এখানেঃ https://youtube.com/watch?v=fSTrmJtHLFU

মোঃ শুভ শিকদার

প্যারালাল ইউনিভার্স

শেখ মোঃ হুমায়েদ হাবিব
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, শাবিপ্রবি
facebook.com/humayed.habib

কখনো কি ভাবনা জেগেছে—আপনার বিপরীত স্বত্ত্বা বলতে আদৌ কিছু আছে কিনা? এমন কি কোনো ভিন্ন মহাবিশ্ব আছে যেখানে রাশিয়া চাঁদে যাবার দৌড়ে আমেরিকাকে হারিয়েছিল? কিংবা এমন কোনো দুনিয়া আছে কিনা যেখানে ডায়নোসররা বিলুপ্ত হয়নি? ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতার কি আসলেই অস্তিত্ব আছে? এই ভাবনাগুলো থেকে জন্ম নেয় উচ্চমাত্রা বা Higher Dimensions-এর ধারণা। এই ধারণা আমাদেরকে সমান্তরাল মহাবিশ্বে উঁকি দেওয়ার প্রয়াস এনে দেয়।

সমান্তরাল মহাবিশ্ব বলতে কী বুঝায় তা জানার আগে একাধিক মহাবিশ্ব সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। আজকের সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বে আমরা যা দেখি সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে একটি মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে। একে বলা হয় বিগ ব্যাং। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব অনুসারে একসময় মহাবিশ্ব ছিল অসীম ঘনত্বের একটি অনন্যতার বিন্দু (Singularity Point)।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্বে সময়ের একটি শুরু ছিল। বিগ ব্যাংয়ের পরেই কেবল আমাদের সবকিছুর শুরু। এর আগে যেহেতু সময় ছিল না, তাই কিছুই বলা সম্ভব না। মহাবিস্ফোরণের আগে যেহেতু সময়ের কোনো অস্তিত্ব ছিল না তাই আমরা মহাবিস্ফোরণের আগে কী ঘটেছিল তা আমরা বলতে পারব না। এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে পদার্থবিজ্ঞানীরা নিয়ে আসেন স্ট্রিং থিওরির ধারণা।

স্ট্রিং থিওরি আসলে কী এটা সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিলেও অধিকাংশের মতের মূল ভিত্তি অভিন্ন। বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ড. মিশিও কাকুর মতে স্ট্রিং থিওরিকে ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের মহাবিশ্বকে কল্পনা করতে হবে একটি সাবানের বুদবুদের মতো করে। এ অতিকায় বুদবুদ (বুদবুদটি সম্প্রসারণশীল) মহাবিশ্বের মধ্যে আমরা আটকে আছি এবং এই বুদবুদ আমরা ভেদ করে যেতে পারি না।

স্ট্রিং থিওরি বহু মহাবিশ্ব বা মাল্টিভার্স সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং মহাবিস্ফোরণের কারণ ব্যাখ্যা করে। স্ট্রিং থিওরি অনুযায়ী আমাদের মহাবিশ্ব একা নয় বরং আরো অসংখ্য মহাবিশ্ব (বুদবুদ) আছে। একটি বুদবুদের সাথে আরেকটি বুদবুদের সংঘর্ষ হয়ে অন্য একটি নতুন বুদবুদ গঠন করতে পারে কিংবা একটি বুদবুদ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি আলাদা বুদবুদ গঠন করতে পারে। আর এটাই মহাবিস্ফোরণ এর কারণ। দুটি মহাবিশ্বের সংঘর্ষে একটি মহাবিশ্ব পরিণত হতে পারে কিংবা একটি মহাবিশ্ব থেকে দুটি মহাবিশ্বও সৃষ্টি হতে পারে।

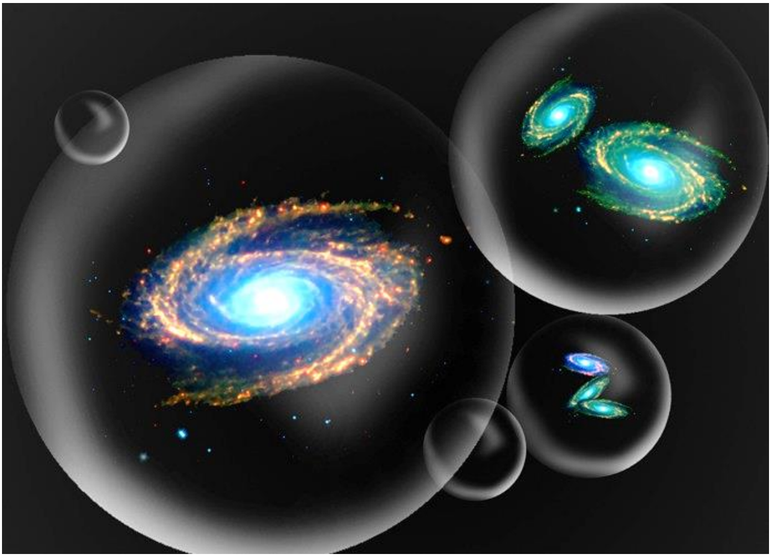

চিত্র: বুদবুদ মহাবিশ্ব

এখন যদি একাধিক মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকে তাহলে কি এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে যেতে পারব? এটি একটি জটিল প্রশ্ন হলেও হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমরা একদিন স্থান-কালের অন্যান্য মাত্রার (স্ট্রিং থিওরি অনুযায়ী স্থান কালের দশটি বা ততোধিক মাত্রা বিদ্যমান) মধ্যে প্রবেশ করতে পারব এবং এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে যেতে পারব।

কিন্তু স্থান-কালের অন্যান্য মাত্রায় প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, প্রয়োজন হবে প্রচণ্ড শক্তির। তাছাড়া অন্যান্য মাত্রায় প্রবেশ শারীরিকভাবে সম্ভব কিনা তাও প্রশ্নবিদ্ধ। হয়ত সম্ভব হতে পারে কারণ টাইম ট্রাভেলিংয়ের সম্ভাবনা আইনস্টাইনের তত্ত্বগুলোতে পাওয়া যায়। কিন্তু টাইম মেশিন তৈরি করা এখনো সুদূর ভবিষ্যতের গল্প।

পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংও মাল্টিভার্সের অস্তিত্বের পক্ষে মত পোষণ করেছেন। তবে এসব মহাবিশ্বের মধ্যে কোন কোন মহাবিশ্বে আমাদের মতো কোনো স্বত্ত্বা আছে কিনা তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে এক একটি যমজ বুদবুদ মহাবিশ্ব (Twin universes) উচ্চ মাত্রায় একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত থাকবে। অর্থাৎ আমরা উচ্চ মাত্রায় প্রবেশ করতে পারলে এসব মহাবিশ্বে যেতে পারব এবং আমাদের যমজ বিপরীত স্বত্ত্বার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারব।

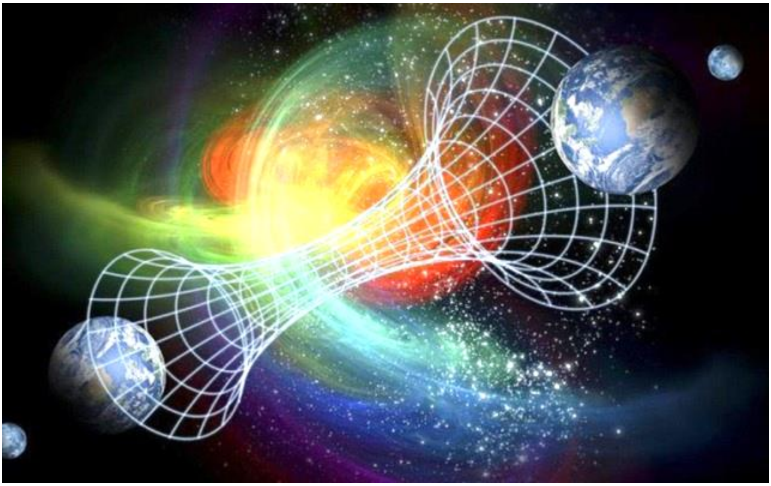

চিত্র: উচ্চ মাত্রায় প্রবেশ করতে পারলে যাওয়া সম্ভব হবে জমজ মহাবিশ্বে

তবে উচ্চ মাত্রায় প্রবেশ করার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না তা নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে। উচ্চ মাত্রার ধারণায় আপনি যখন উচ্চতর থেকে উচ্চতর মাত্রায় প্রবেশ করবেন তখন আপনি বুদবুদ মহাবিশ্বসমূহের আরো গভীরে প্রবেশ করবেন। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ কিংবা আরো উচ্চতর মাত্রায় প্রবেশ করতে থাকলে যমজ মহাবিশ্বসমূহ থেকে বেরিয়ে অন্যান্য মহাবিশ্বেও যাওয়া যাবে।

এসব মহাবিশ্বের বাস্তবতা ও ইতিহাস কি আমাদের চেয়ে ভিন্ন। এর সঠিক উত্তর জানার জন্য তাকাতে হবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যায়। শ্রোডিংগারের সমীকরণে। বিজ্ঞানী এরভিন শ্রোডিংগার তার সমীকরণ দ্বারা প্রমাণ করেছেন মৌলিক কণাগুলো (Subatomic Particles) একই সময়ে বিভিন্ন অবস্থানে থাকতে পারে। কিন্তু যখন কেউ পর্যবেক্ষণ করতে চায় তাদের তখন তাদের ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতাগুলো একটিমাত্র বাস্তবতায় রূপ নেয়।

ধরুন আপনি কোন রেস্তোরাঁয় গিয়ে ২০ ধরনের খাবারের মধ্যে মাত্র ১ টি অর্ডার করলেন। আপনার সামনে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে খাবার পরিবেশন করা হলো। আপনি ঢাকনা সরাতেই দেখলেন, যে খাবারটি আপনি বেছে নিয়েছেন সেটিই আছে। ভুলে অন্যটি পড়ে যায়নি। এটা স্বাভাবিকতা হলেও কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ধারণা দেয় যে আপনার সামনে ঢাকা খাবারটি ২০টি খাবারের মধ্যে সম্ভাব্য সবটিই। ঢাকনা সরানোর আগে ২০ ধরনের খাবারই ঢাকনার মধ্যে মুহূর্তে বিদ্যমান হয়ে অদৃশ্য হচ্ছে আবার পরক্ষণে হাজির হচ্ছে। কিন্তু ঢাকনা সরানোর সাথে সাথে একটি বাস্তবতায় (Reality) স্থান পাচ্ছে।

এই ঘটনাটি সেকেন্ডের চেয়ে মিলিয়ন মিলিয়ন গুণ দ্রুত হচ্ছে বলে আমরা তা টের পাই না। কেউ কেউ কল্পনা করেন আপনার সমান্তরাল বিশ্বের একটিতে আপনি এই ২০ খাবারের একটি খাচ্ছেন (মনে করুন বার্গার) আর অন্যটিতে খাচ্ছেন অন্য খাবার (মনে করুন পিজ্জা)। বাস্তবতায় ২০ ধরনের সম্ভাবনার মধ্যে একটি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অন্য সমান্তরাল বিশ্বে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে অন্য বাস্তবতা।

প্রত্যেকটি সমান্তরাল বিশ্বে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটে যাচ্ছে কিন্তু তা সকল সমান্তরাল যমজদের (Parallel Twins) কারোরই দৃষ্টিগোচর হয় না বরং প্রত্যেকের জন্য সৃষ্টি হয় নিজস্ব বাস্তবতা। বলে রাখা উচিৎ একাধিক মহাবিশ্বের যেসবে আমাদের সমান্তরাল যমজদের অস্তিত্ব আছে সেসবে তাদের ইতিহাস তাদের ভৌত বিধি আমাদের মতো হওয়া উচিত। যেসব মহাবিশ্বে বিজ্ঞানের নিয়ম নীতি ভিন্ন সেখানে হয়তো আমাদের যমজদের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা নেই কারণ সেখানে থাকতে পারে অন্য ধরনের ভৌত নিয়ম। আর অন্য নিয়মের মহাবিশ্ব যদি প্রাণ বিকাশের উপযোগী হয় তাহলে তাদের সমান্তরাল যমজদেরও ইতিহাস ভৌত বিধি একই হওয়া উচিত।

অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন সমান্তরাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিবস্তু (Antimatter) দিয়ে তৈরি হতে পারে। এর ফলে বুদবুদ মডেল অনুসারে আমাদের মহাবিশ্বের সাথে প্রতি মহাবিশ্বের সংঘর্ষে উভয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। আবার অনেকে বিশ্বাস করেন মহাবিস্ফোরণের পর কণা প্রতিকণা একই অনুপাতে সৃষ্টি হলেও এদের ক্রমাগত সংঘর্ষে কণার সংখ্যা প্রতিকণার চেয়ে বেশি হয়ে যায়।

প্রশ্ন হতে পারে কীভাবে কণার সংখ্যা প্রতিকণার চাইতে বেশি হতে পারে? ধরুন, কণা এবং প্রতিকণা উভয়ে দাবা খেলায় অংশ নিয়েছেন। দাবা খেলায় উভয়েই সমান তালে খেলে একজনকে আরেকজন পরাস্ত করেন আর শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে যায় কণা। অর্থাৎ শেষ বিন্দুতে কোনো একটা গুটি বেঁচে থাকে আর সেই গুটিটি কণা দলের।

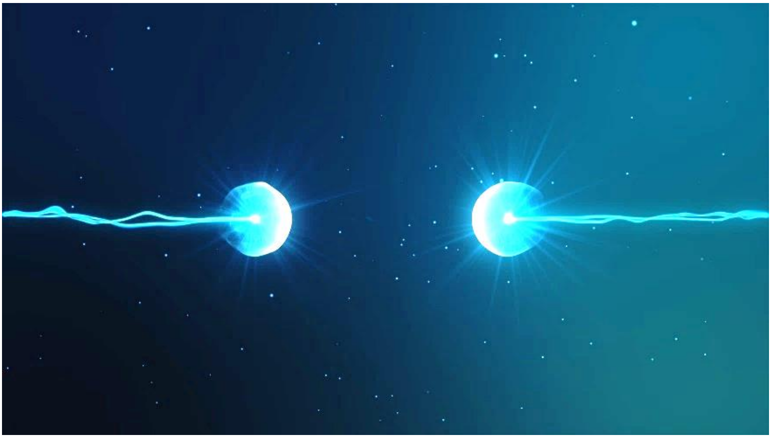

চিত্র: সমান্তরাল মহাবিশ্ব তৈরি হতে পারে প্রতিপদার্থ দিয়ে

আবার কয়েকটি গবেষণায় বিজ্ঞানীদের দাবি, যেহেতু শক্তির বিনাশ নেই, আর কৃষ্ণ গহ্বর পতিত হলে কোনো শক্তি ফিরে আসে না, তাই যখন কোনো বস্তুকৃষ্ণ গহ্বরে পতিত হয়

তখন তা সমূলে ধ্বংস হয় না বরং অন্য মহাবিশ্বের শ্বেতগহ্বর (White Hole – যা পুরোপুরি কৃষ্ণ গহ্বরের মতো নয়, যা থেকে আলো বেরিয়ে আসে) এর মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসে। অর্থাৎ এক মহাবিশ্বের শক্তি অন্য মহাবিশ্বে স্থানান্তর হচ্ছে। শক্তির অবিনশ্বরতা নীতি থেকে এটি ধারণা করা হচ্ছে।

তাই এই ধারণায় বলা যায় কৃষ্ণ গহ্বর আর শ্বেতগহ্বর হলো দুটি সমান্তরাল মহাবিশ্বের সংযোগ সেতু। তবে এই ধারণাটি কতটুকু নির্ভরযোগ্য তা জানতে হলে আমাদের কৃষগহ্বর সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হবে। জানতে হবে ডার্ক ম্যাটার সম্পর্কেও।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যাচ্ছেন, যদি আসলেই প্যারালাল ইউনিভার্স থেকে থাকে তাহলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমরা সেখানে বার্তা আদান প্রদান করতে পারব। সময়ই হয়তো সকল প্রশ্নের সমাধান দেবে।

তথ্যসূত্র

1) https://gaia.com/article/white-hole-theory
2) https://nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-is-a-black-hole-58.html
3) https://truthunsealed.com/unexplained/scientists-may-have-found-proof-of-alternate-parallel-universe/
4) https://forbes.com/sites/startswithabang/2018/07/17/what-is-and-isnt-scientific-about-the-multiverse/#4e21ad4b25c4

গোলমেলে সমীকরণ

ডিয়োফ্যান্টাইন ইকুয়েশন। আলেকজান্দ্রিয়ার ডিয়োফ্যান্টাস নামক এক প্রাচীন গণিতবিদের নামে এই সমীকরণ। $x^3 + y^3 + z^3 = k$। এই সমীকরণে k এর মান ধরা যাবে ১ থেকে অসীম পর্যন্ত যেকোনো পূর্ণ সংখ্যা। এবার চ্যালেঞ্জ হলো x, y আর z মান বের করা যাদেরকে ঘন করে যোগ করলে পাওয়া যাবে k এর সমান মান। এই মানগুলো যেকোন বড় বা ছোট ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যা হতে পারবে। গণিতবিদেরা সেই ১৯৫০ এর দশক থেকে k সব অকাট্য মান বের করার চেষ্টা করছেন। এবং তারা আবিষ্কার করেছেন যে কিছু সংখ্যার জন্যে এটা কখনো অকাট্য হয় না। যেমন- সেসব সংখ্যা যাদের ৯ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ হিসেবে ৪ বা ৫ থাকে। এ হিসেবে ১০০ এর নীচে প্রায় ২২টি সংখ্যা বাদ পড়ে যায় যাদের কখনোই k এর মান হিসেবে নেওয়া যাবে না। বাকি ৭৮টির মধ্যে সবগুলোই k এর মান হিসেবে অকাট্য হওয়ার কথা। কিন্তু এদের মধ্যে আবার দুটি সংখ্যা নিয়ে গণিতবিদেরা বেশ নাকানিচুবানি খাচ্ছিলেন দুটি সংখ্যা হলো: ৩৩ এবং ৪৪। তবে সম্প্রতি এক গণিতবিদ ৩৩ কে k এর মান হিসেবে নিয়ে x, y ও z এর মান বের করে একেও অকাট্য হিসেবে প্রমাণ করেছেন। বাকি রইলো ৪৪। সেটা বাড়ির কাজ হিসেবে রইলো। ও, হ্যাঁ। ৩৩ কীভাবে অকাট্য হলো? বেশ।

$(8,866,128,975,287,528)^3 + (-8,778,405,442,862,293)^3 + (-2,736,111,468,807,040)^3 = 33$।

আর এ সমাধান করেছেন ব্রিস্টন ইউনিভার্সিটির গণিতবিদ প্রফেসর এন্ড্রু বুকার।

হাসনাত বিন জুবায়ের

পৃথিবীর বুকে কৃত্রিম সূর্য

সোলাইমান হোসেন রবিন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, শাবিপ্রবি, সিলেট
facebook.com/SH.Robin.55

কেমন হতো যদি সূর্যের মতো বিপুল শক্তির উৎস আমরা পৃথিবীতে বসেই তৈরি করতে পারতাম, যাতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জ্বালানির কোনো অভাব থাকত না। সূর্যের মতো বিশাল আকৃতির না হলেও বিজ্ঞানীরা কিন্তু সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রারও বেশি তাপমাত্রা তৈরি করেছেন সেই উনিশশো সত্তরের দশকেই। সম্প্রতি চীনের বিজ্ঞানীরা Experimental Advanced Superconducting Tokamak সংক্ষেপে EAST-এ প্লাজমার তাপমাত্রা ১০০ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াসে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন। উল্লেখ্য সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা মাত্র ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থাৎ সূর্য থেকেও প্রায় ৭ গুণ বেশি তাপমাত্রা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

EAST হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র ফিউশন রিয়েক্টর যেটি চীনের হেফেই শহরে অবস্থিত। এই যন্ত্রের দ্বারা স্থায়ী ফিউশন বিক্রিয়া ঘটানোর পরীক্ষা চলছে। ফিউশন বিক্রিয়া সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক। ফিউশন হল একটি তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়া যেখানে হালকা মৌলের দুটি নিউক্লিয়াস মিলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস তৈরি করে। যেমন হাইড্রোজেনের দুটি আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম এবং ট্রিটিয়ামের মধ্যে ফিউশন বিক্রিয়া সংঘটিত হলে একটি হিলিয়াম পরমাণু ও একটি নিউট্রন কণা উৎপন্ন হয়।

$$H_2 + H_3 \rightarrow He_4 + n$$

আবদ্ধ ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভরের নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী, বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভর একই হওয়ার কথা। কিন্তু বিক্রিয়ার আগে ও পরে ভর মেপে দেখা যায় উৎপন্ন পদার্থের ভর বিক্রিয়কের ভর অপেক্ষা কিছুটা কম হয়। এই হারানো ভর থেকে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ শক্তি রূপান্তরিত হয়ে তাপ ও আলোকশক্তি হিসেবে নির্গত হয়। এই বিক্রিয়া প্রধানত সূর্যসহ অন্যান্য নক্ষত্রে ঘটে থাকে। সূর্যে এই বিক্রিয়া ঘটে বলেই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন গ্যাসকে হিলিয়ামে রূপান্তর করছে এবং বিক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হচ্ছে।

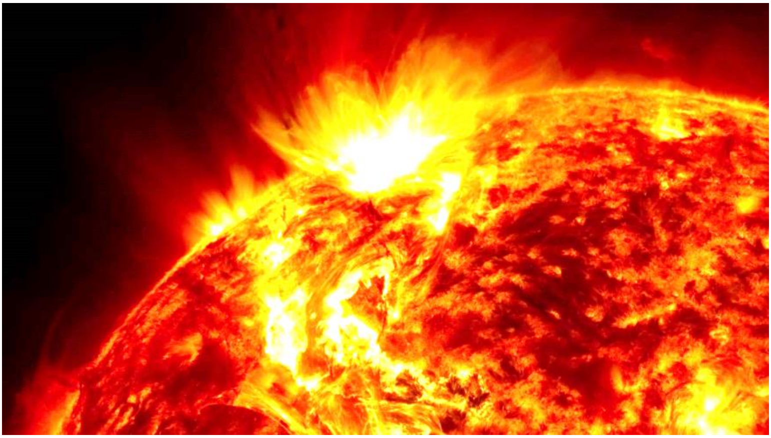

চিত্র: সূর্যের বুকে প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া

নক্ষত্রে ফিউশন বিক্রিয়ায়, পর্যায়ক্রমে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম এবং কার্বন থেকে লোহা পর্যন্ত উৎপন্ন হয়। ভারী মৌল উৎপন্ন হওয়া নির্ভর করে নক্ষত্রের আকার ও ভরের উপর। কারণ ভারী মৌলের ফিউশন ঘটতে অত্যধিক চাপ এবং তাপমাত্রার প্রয়োজন, যা নক্ষত্রের কেন্দ্রে মহাকর্ষ বল দ্বারা সৃষ্টি হয়। তাই নক্ষত্র যত ভারী হবে তত ভারী মৌলের ফিউশন ঘটা সম্ভব হবে।

আমরা ফিউশন বিক্রিয়ায় বিকিরিত শক্তির পরিমাণ আইনস্টাইনের ভর-শক্তির বিখ্যাত সমীকরণ $E= mc^2$ হতে পরিমাপ করতে পারি। পারমাণবিক শক্তির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটিই হল তার পরিমাণ। অতি ক্ষুদ্র ভর থেকে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় তা অকল্পনীয়। গাণিতিক হিসেব অনুযায়ী ফিউশন বিক্রিয়ায় এক গ্রাম ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হলে ভর-শক্তি সূত্রানুসারে নয় কোটি মেগাজুল শক্তি উৎপন্ন হবে।

যেখানে বাংলাদেশের দৈনিক বৈদ্যুতিক চাহিদানুযায়ী প্রতি সেকেন্ডে উৎপাদিত হয় মাত্র সাড়ে এগারো হাজার মেগাজুল। অর্থাৎ ঐ পরিমাণ শক্তি দিয়ে বাংলাদেশ অনায়াসে প্রায় আড়াই বছর কাটিয়ে দিতে পারবে, তাত্ত্বিকভাবে।

ফিউশন প্রক্রিয়াটি খুব একটা সহজ নয়। কারণ এই প্রক্রিয়ায় দুটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস পরস্পর মিলিত হতে হবে। আমরা জানি, পরমাণুর নিউক্লিয়াস ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট। অর্থাৎ বিক্রিয়ায় দুটি ধনাত্মক চার্জ মিলিত হবে। কিন্তু কুলম্বের স্থির তড়িৎ বলের সমীকরণ বলছে সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। সুতরাং তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়া কঠিনই

বটে। কিন্তু সূর্যের কেন্দ্রে আছে মহাকর্ষ বলের দরুণ অসম্ভব রকমের চাপ, যা সংঘর্ষ হতে বাধ্য করে। সূর্যের কেন্দ্রে ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিরন্তর ভাবে ফিউশন বিক্রিয়া চলছে। এই তাপমাত্রায় পৃথিবীতে ফিউশন বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব নয়, কারণ আমাদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করার প্রযুক্তি নেই।

তবে যত বেশি তাপমাত্রা সৃষ্টি করা যায় তত বেশি গতিতে পরমাণুসমূহ ছোটাছুটি করে, ফলে সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তাই প্রচুর পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমেও ফিউশন বিক্রিয়া ঘটতে পারে। EAST এর মতো রিয়েক্টর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কাজটি করে থাকে।

EAST রিয়েক্টরটি ডোনাট আকৃতির যার ভিতরে বায়ুশূন্য চেম্বার রয়েছে। এর ভিতরে Superconducting Magnetic এবং চেম্বারের চারপাশে শক্তিশালী শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে।

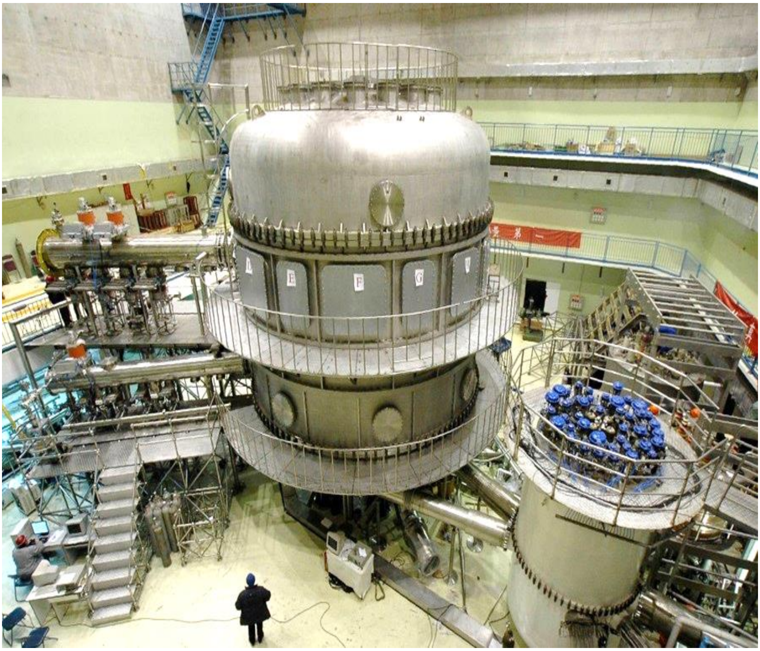

চিত্র: চীনের EAST রিয়েক্টরে গবেষণা চলছে

পর্যায় সারণীর প্রথম মৌল হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা বলে এর পারমাণবিক বন্ধন শক্তি সবচেয়ে কম। তাই অন্যান্য মৌলের তুলনায় সবচেয় কম তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনের ফিউশন ঘটানো সম্ভব। তাই ফিউশন রিয়েক্টরগুলোতে জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়।

হাইড্রোজেন গ্যাসকে তাপ প্রয়োগ করলে গ্যাসের অণু ভেঙে পরমাণুসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্তভাবে বিরাজ করতে শুরু করে এবং একসময় পরমাণুর নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের মধ্যকার বন্ধন ভেঙে নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন মুক্তভাবে বিচরণ করতে থাকে। তাপমাত্রা

৫০,০০০ - ১,৫০,০০০ কেলভিনে উন্নীত করলে গ্যাসের কোনো পরমাণু বিদ্যমান থাকে না। ধনাত্মক চার্জের নিউক্লিয়াস ও ঋণাত্মক চার্জের ইলেকট্রন মুক্তভাবে উচ্চগতিতে ছোটাছুটি করতে থাকে। অনেকটা ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের স্যুপের মতো, একে বলে পদার্থের প্লাজমা দশা। প্লাজমা অবস্থায় পদার্থ তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় পদার্থের নিউক্লিয়াস মুক্ত হয় বলে ফিউশন ঘটানো সম্ভব হয়।

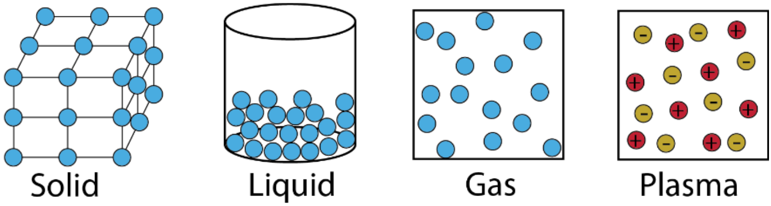

চিত্র: পদার্থের চার অবস্থা

কিন্তু শুধুমাত্র প্লাজমা অবস্থা প্রাপ্ত হলেই ফিউশন ঘটবে না, কারণ আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি দুটি ধনাত্মক নিউক্লিয়াস পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। তাই নিউক্লিয়াসের গতিশক্তি এমন পরিমাণে বাড়াতে হবে যাতে এই বিকর্ষণ বল কাটিয়ে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে। আর গতিশক্তি বাড়াতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে তাপমাত্রা বাড়াতে হবে। তাপমাত্রাকে পদার্থের অণু-পরমাণুর গতিশক্তির পরিমাণ হিসেবে চিন্তা করা যায়। কোন পদার্থের কম তাপমাত্রা এবং বেশি তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য হল পদার্থের অণু-পরমাণুর গতিশক্তি কম নাকি বেশি।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন দীর্ঘ সময় ধরে ফিউশন বিক্রিয়া স্থায়ী করার জন্য প্লাজমার তাপমাত্রা ১০০ মিলিয়ন থেকে ১৫০ মিলিয়ন কেলভিনে উন্নীত করা প্রয়োজন। রিয়েক্টরে প্লাজমা কণার ঘনত্ব, তাপমাত্রা ও বিক্রিয়ার সময়- এই তিনটির সমন্বয় করা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। এই তিনটি পরিমাপকের গুণফলকে ত্রৈধ ফলাফল বলা হয়। ত্রৈধ ফলাফলের একটি নির্দিষ্ট মানের জন্য রিয়েক্টরে ফিউশন বিক্রিয়া স্থায়ী হয়। তখন ফিউশনে উৎপন্ন তাপের মাধ্যমেই প্লাজমা যথেষ্ট উত্তপ্ত থাকে। ফলে বাহ্যিকভাবে তাপ প্রয়োগ ছাড়াই বিক্রিয়া নিজে নিজে চলতে থাকবে।

চীনের ইনিস্টিটিউট অব প্লাজমা ফিজিক্সের বিজ্ঞানীগণ EAST রিয়েক্টরে ১০০ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০ সেকেন্ড ফিউশন বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। এটি চীনের জন্য মাইলফলক। যদিও অন্যান্য দেশের বেশ কিছু ফিউশন গবেষণাগারে কম-বেশি সফলতা পাওয়া গেছে।

১। যুক্তরাষ্ট্রের কিছু ফিউশন গবেষণাগারে প্লাজমার তাপমাত্রা কয়েক শ' মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াসে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

২। ফ্রান্সের Tore Supra Tokamak এ এখন পর্যন্ত সবচেয়ে লম্বা সময় ধরে বিরতিহীনভাবে ফিউশন বিক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে, ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ড।

৩। জাপানের JT-60 Tokamak প্লাজমা ঘনত্ব, বিক্রিয়ার স্থায়ীত্ব এবং তাপমাত্রার সমন্বয়ে ফিউশন ঘটিয়ে সর্বোচ্চ সফলতা পেয়েছে।

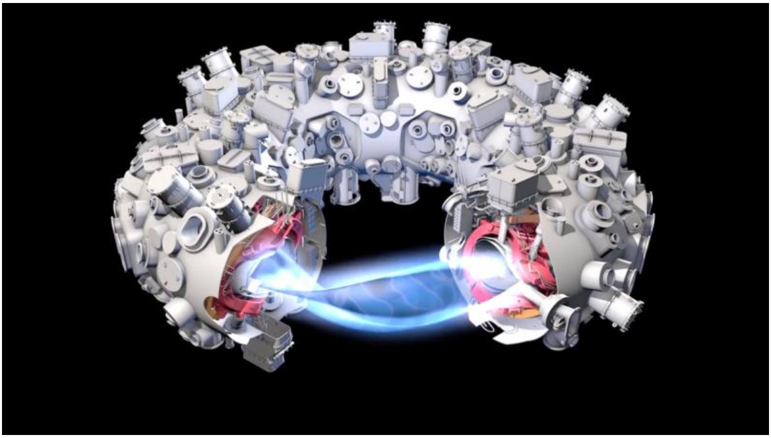

চিত্র: একটি ফিউশন রিয়েক্টরের প্রোটোটাইপ

তাপ-পারমাণবিক গবেষণা সংস্থা ইউরো-ফিউশন JET (Joint European Torus) টোকাম্যাকে ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মত নিয়ন্ত্রিত ফিউশন থেকে শক্তি উৎপাদন করা হয়েছিল। সেখানে ২৪ মেগাওয়াট শক্তি খরচে ১৬ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদিত হয়েছিল।

উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) নামক ফিউশন ডিভাইস তৈরির বহুজাতিক প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়। চীন, রাশিয়া, আমেরিকাসহ ৩৫টি দেশের সহযোগিতায় ITER প্রজেক্টের কাজ চলছে। এই রিয়েক্টরটি এমনভাবে ডিজাইন করা হচ্ছে যেন ৫০ মেগাওয়াট তাপশক্তি ব্যবহার করে ৫০০ মেগাওয়াট শক্তি উৎপন্ন করা যায়। অর্থাৎ দশগুণ বেশি শক্তি উৎপন্ন হবে। এর জন্য ITER রিয়েক্টরে ১৫০ মিলিয়ন (প্রায়) কেলভিন তাপমাত্রায় কমপক্ষে ৩০০ সেকেন্ড ফিউশন বিক্রিয়া স্থায়ী রাখতে হবে। এটি সম্ভব হলে উৎপন্ন তাপশক্তি সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা তুলনামূলক সহজ ব্যাপার।

ফিউশন রিয়েক্টর সমূহের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম হল উচ্চ তাপমাত্রায় প্লাজমা কীভাবে রিয়েক্টরের ভেতরে নিরাপদে আবদ্ধ রাখা যায়। কারণ, প্লাজমা তাপমাত্রায় কোন পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থায় টিকে থাকতে পারে না। মনে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে প্লাজমা ধারক চেম্বার কীভাবে টিকে থাকে? এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা Magnetic Confinement নামক দারুণ একটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এই পদ্ধতিতে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা উত্তপ্ত প্লাজমাকে ডোনাট আকৃতির চেম্বারে ভাসিয়ে রাখা হয়।

প্লাজমা অবস্থায় পরমাণুর ইলেক্ট্রন, নিউক্লিয়াস বিচ্ছিন্ন ভাবে চার্জিত কণারূপে ছোটাছুটি করে। আমরা জানি, চৌম্বক ক্ষেত্রে কোন চার্জিত কণা গতিশীল হলে কণাটির উপর চৌম্বকীয় বল ক্রিয়াশীল হয়। ফলে আমরা যদি প্লাজমাকে চারপাশ থেকে চৌম্বকীয় বল দিতে পারি তাহলে প্লাজমা শূন্যে ভেসে থাকবে। চৌম্বক ক্ষেত্রে চার্জিত কণার এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে প্লাজমাকে চেম্বারের প্রাচীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা যায়।

প্লাজমা ভেসে থাকলেও কিছু পরিমাণ তাপ পরিবাহিত হয়ে প্রাচীরকে উত্তপ্ত করার সম্ভবনা থাকে। কিন্তু প্রাচীরের চারপাশে শক্তিশালী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা থাকায় প্রাচীর উত্তপ্ত

হয়না। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা তাপ শোষণ করার মাধ্যমে প্রাচীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখে। রিয়েক্টরে ব্যয়িত শক্তির প্রায় ৮০ ভাগই খরচ হয়ে যায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা পরিচালনায় এবং বাকি ২০ ভাগ তাপমাত্রা বৃদ্ধি, প্লাজমাকে নিরাপদে রাখা ও অন্যান্য কাজে খরচ হয়।

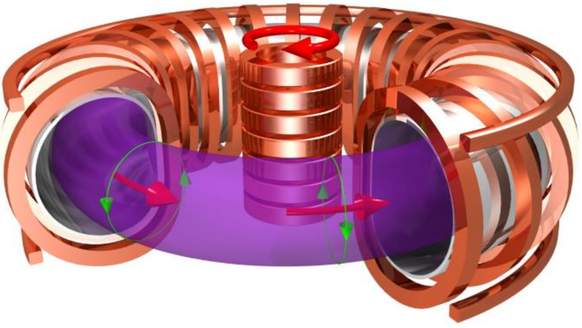

চিত্র: ম্যাগনেটিক কনফাইনমেন্ট নামক বিশেষ এক পদ্ধতিতে প্লাজমাকে ভাসিয়ে রাখা হয়।

রিয়েক্টরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কাজটিও প্রধানত চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা করা হয়। শুরুতে ডোনাট আকৃতির চেম্বারে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ নিক্ষেপ করে চেম্বারের কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র চালু করা হয়। আমরা জানি পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র মাত্রই তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে। হাইড্রোজেনের গ্যাসীয় মিশ্রণে উচ্চ বিভব পার্থক্যের তড়িৎপ্রবাহ প্রবাহিত হওয়ার কারণে হাইড্রোজেন পরমাণুসমূহের সাথে ইলেকট্রনের তীব্র সংঘর্ষ হয়। ফলে হাইড্রোজেন পরমাণু ভেঙে আয়নিত গ্যাসে পরিণত হয় এবং প্লাজমা অবস্থায় পৌঁছে যায়।

এরপর চৌম্বক বল দ্বারা প্লাজমাকে ধারক চেম্বারে নির্দিষ্ট দিকে উচ্চগতিতে গতিশীল করা হয়। চৌম্বকক্ষেত্র যত শক্তিশালী হবে, তত বেশি গতিতে প্লাজমা কণাকে গতিশীল করা যাবে অর্থাৎ গতিশক্তি তত বেশি হবে।

আগেই জেনেছি কণার গতিশক্তির পরিমাণকে তাপমাত্রা হিসেবে চিন্তা করা যায়। সুতরাং গতিশক্তি যত বেশি হবে, তাপমাত্রা তত বেশি হবে। এভাবে রিয়েক্টরে প্লাজমার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটি Superconducting Magnetic System দ্বারা পরিচালিত হয়।

কিন্তু শুধুমাত্র চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা ফিউশন সংগঠিত হওয়ার মতো প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা সৃষ্টি করা যায় না। তাই রিয়েক্টরগুলোতে উত্তপ্ত করার বাড়তি ব্যবস্থা থাকে যা প্লাজমায় অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করে। এই বাড়তি তাপীয় ব্যবস্থা প্লাজমায় শক্তিশালী মাইক্রোওয়েভ, রেডিও ওয়েভ এবং উচ্চ গতিশক্তিসম্পন্ন চার্জবিহীন কণা নিক্ষেপ করে যা প্লাজমার কণার সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। ফলে প্লাজমার কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রা শতাধিক মিলিয়ন ডিগ্রিতে পৌঁছায়।

দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ফিউশনে একটি হিলিয়াম পরমাণু এবং একটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন নিউট্রন নির্গত হয়। ফিউশন রিয়েক্টরে উৎপন্ন শক্তির প্রধান উৎস হল এই নিউট্রনের গতিশক্তি। নিউট্রন একটি চার্জ নিরপেক্ষ কণা। তাই এটি রিয়েক্টরে বিদ্যমান চৌম্বকক্ষেত্র

দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এটি নির্গত হয়ে রিয়েক্টরের প্রাচীরে আঘাত করে এবং কণাটির গতিশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। রিয়েক্টরের প্রাচীর থেকে এই তাপশক্তি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা দ্বারা সংগৃহীত হয়।

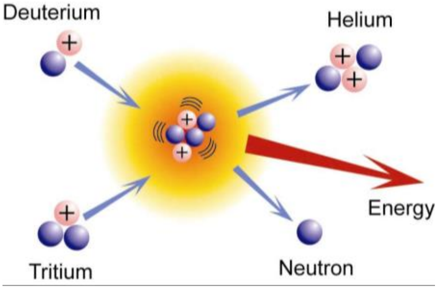

চিত্র: ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম সংযোগে ফিউশন বিক্রিয়া

বর্তমানে যেসব শক্তির উৎস জ্বালানি চাহিদা পূরণ করছে তার মধ্যে অন্যতম কয়লা, তেল ও গ্যাস। কিন্তু এসব জীবাশ্ম জ্বালানির উৎস খুব দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। তাছাড়া এসব জ্বালানি পোড়ানো হলে কার্বন নিঃসৃত হয় যা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। তাই পৃথিবীর ভবিষ্যত চিন্তা করে নতুন উৎসের কথা না ভেবে উপায় নেই।

নতুন উৎস বলতে বাকি রইল নবায়নযোগ্য শক্তি ও পারমাণবিক শক্তির উৎস। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস এখনও ক্রমবর্ধমান চাহিদার মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়। পারমাণবিক শক্তি দুই প্রকারে উৎপন্ন করা যায়, যথাক্রমে ফিশন বিক্রিয়া ও ফিউশন বিক্রিয়া। যদিও ফিশন প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। তবে পারমাণবিক ফিশন প্রক্রিয়ার ভারী জ্বালানি তেজস্ক্রিয় মৌলের মজুদ একসময় শেষ হয়ে আসবে। কিন্তু শক্তির চাহিদা ক্রমে বাড়তেই থাকবে।

চিত্র: নিউক্লিয়ার ফিশনের জন্য তেজস্ক্রিয় মৌলের মজুদ একসময় শেষ হয়ে যেতে পারে।

তাছাড়া ফিশন প্রক্রিয়ার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। তাই আমাদের নির্ভরযোগ্য একটি শক্তির উৎস হতে পারে ফিউশন প্রক্রিয়া। ফিউশন রিয়েক্টরে জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম প্রয়োজন।

ডিউটেরিয়াম প্রকৃতিতে সহজলভ্য হলেও তেজস্ক্রিয় ট্রিটিয়াম পাওয়া যায় না। কিন্তু বিক্রিয়ায় লিথিয়ামকে ভেঙে সহজেই ট্রিটিয়াম পাওয়া সম্ভব। রিয়েক্টরের মাধ্যমে লিথিয়াম থেকে ট্রিটিয়াম পাওয়ার জন্য 'ট্রিটিয়াম ব্রিডিং' নামক একটি পদ্ধতির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এটি সম্ভব হলে শুধুমাত্র সমুদ্রের পানি থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে প্রায় ৬ মিলিয়ন বছর শক্তির চাহিদা মিটানো সম্ভব।

এটি কোন প্রকার কার্বন নিঃসরণ করে না। তাছাড়া ট্রিটিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা ফিশন বিক্রিয়ার জ্বালানি ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়ামের তুলনায় নগণ্য। বোঝাই যাচ্ছে পারমাণবিক ফিউশন প্রক্রিয়া, ফিশন প্রক্রিয়া অপেক্ষা নিরাপদ, ঝুঁকিমুক্ত। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার এই পর্যায়ে পৃথিবীর বুকে বহু কৃত্রিম সূর্য পারে আমাদের জ্বালানি সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী ও পরিবেশবান্ধব সমাধান দিতে।

তথ্যসূত্র

1. http://fusion-magnetique.cea.fr/gb/fusion/histoire/site historique.htm
2. http://english.hf.cas.cn/
3. http://english.cas.cn/newsroom/news/201811/t20181113_201191.shtml
4. https://newatlas.com/fusion-china-artificial-sun-east/57237/
5. http://bpdb.gov.bd/bpdb_new/index.php/site/office_head
6. http://wag.caltech.edu/home/jsu/Thesis/node31.html
7. https://bigganjatra.org/atomic-energy-06/
8. https://euro-fusion.org

স্পেসস্যুট ছাড়া মহাকাশে

যদি স্পেসস্যুট ছাড়া অর্থাৎ কোনরকম সুরক্ষা না নিয়ে আমরা মহাশূন্যে যাই তাহলে কী হবে? যত যা-ই করা হোক না কেন দম আটকে রাখা যাবে না। কারণ মহাশূন্যের শূন্যতা আমাদের শরীর থেকে সব বাতাস বের করে নেবে। ফুসফুসে যদি বাতাস থেকে থাকে তবে তা ফেটে যাবে। শরীরে থাকা বাকি অক্সিজেনেরও সম্প্রসারণ হবে, শরীর স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ মোটা হবে। তবে শরীর বিস্ফোরিত হবে না। কারণ আমাদের চামড়ার স্থিতিস্থাপকতা এ সম্প্রসারণ চাপকে ধরে রাখার জন্যে যথেষ্ট। তবে এর মানে আমরা খুব বেশি সময় বেঁচে থাকতে পারবো এমন না। অরক্ষণশীল অবস্থায় মহাশূণ্যে আমাদের টিকে থাকার সময়কাল মাত্র পনের থেকে ত্রিশ সেকেন্ড। আর এর মাত্র নব্বই সেকেন্ড পরই আমাদের দেহ হয়ে যাবে একদম বরফশীতল। অবশ্য মহাশূন্যে অবস্থানভেদে তা ১২ থেকে ২৬ ঘন্টা সময় নিতে পারে।

হাসনাত বিন জুবায়ের

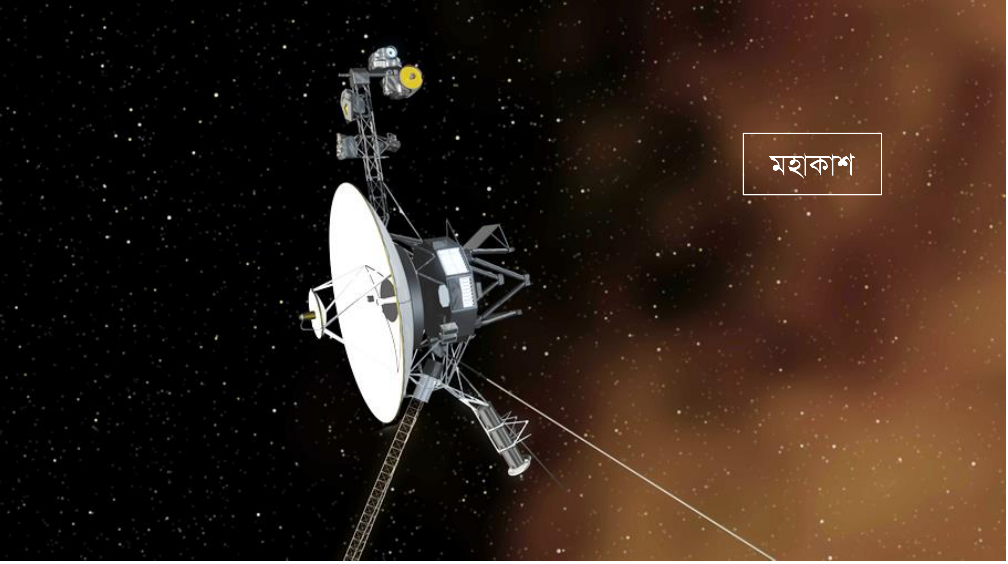

মহাকাশ

ভয়েজার: অসীমের পথে মানুষের তৈরি দুই যান

ইসরাত জাহান নূর
সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ
facebook.com/isratjahan.nooresha

চিত্র: ভয়েজার-২ মহাকাশযানের উড্ডয়ন মুহূর্ত

২০১৮ সালে, বছরের প্রায় শেষের দিকে হেলিওস্ফিয়ার অতিক্রম করে ইন্টারস্টেলার স্পেসে প্রবেশের মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্য এক বিরাট সাফল্য বয়ে এনেছে ভয়েজার-২ নামক মহাকাশযানটি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোনো গ্যালাক্সির নক্ষত্র ব্যবস্থাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় 'ইন্টারস্টেলার স্পেস'। এখানে নক্ষত্র ব্যবস্থা বলতে এক বা একাধিক নক্ষত্র এবং তাদের মহাকর্ষ বলের অধীনে থাকা সবকিছু নিয়ে গঠিত সিস্টেমকে বোঝানো হচ্ছে। ইন্টারস্টেলার স্পেসে থাকা উপাদানগুলোর মধ্যে আছে আয়নিক, আণবিক বা পারমাণবিক অবস্থায় থাকা গ্যাস, ধূলিকণা, মহাজাগতিক রশ্মিসহ বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ।

মহাকাশে সূর্য তার চারপাশে বাবলের মতো একধরনের অঞ্চল তৈরি করে আছে যার অভ্যন্তরে সৌর বায়ুর (solar wind) প্রভাব বেশি এবং মহাজগতের অন্য কোনো স্থান থেকে আগত মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব সেখানে কম। পৃথিবীসহ সৌরজগতের বাকি গ্রহগুলোর অবস্থান এর অভ্যন্তরেই। অর্থাৎ এটি গ্রহগুলোকে অত্যন্ত শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা দিচ্ছে। এই অঞ্চলটিকেই বলে হেলিওস্ফিয়ার। একটা জায়গায় এসে সৌর বায়ুর গতি ইন্টারস্টেলার স্পেসের চাপের প্রভাবে হঠাৎ করেই মন্থর হয়ে যায়, একে বলে টারমিনেশন শক (Termination shock)।

এটি হেলিওস্ফিয়ারের ভেতরেরই একটি অঞ্চল। এর বাইরের দিকে রয়েছে হেলিওশিথ, যা কিনা ভেতরের হেলিওস্ফিয়ার এবং বাইরের ইন্টারস্টেলার স্পেসের মধ্যে একটি স্থানান্তরিত অঞ্চল (Transitional region)। হেলিওস্ফিয়ারের একেবারে প্রান্তে রয়েছে হেলিওপজ। অর্থাৎ হেলিওস্ফিয়ারের একটি অঞ্চল টারমিনেশন শক যেখানে সৌর বায়ুর গতি হঠাৎ ধীর হয়ে যায়। এর বাইরের দিকে থাকে হেলিওশিথ যেটি কিনা হেলিওস্ফিয়ার আর ইন্টারস্টেলার স্পেসের মধ্যে মিশ্র অঞ্চল, তারপর হেলিওপজ এবং এরপরে পুরোটাই ইন্টারস্টেলার স্পেস। আর এখানেই আছে ভয়েজার-২। তবে হেলিওস্ফিয়ার অতিক্রমের ঘটনা এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বেই ভয়েজার-১ ইন্টারস্টেলার স্পেসে প্রবেশ করেছিল ২০১৩ সালে।

১৯৭৭ সালে পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশে যাত্রা শুরু করেছিল ভয়েজার-১ এবং ভয়েজার-২। মহাকাশযান দুটির নকশা করা হয়েছিল মূলত বৃহস্পতি এবং শনি গ্রহ, শনির বলয় এবং গ্রহ দুটির উপগ্রহ সম্পর্কে কাছ থেকে জানার জন্য। পাঁচ বছরের মিশন নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল মহাকাশযান দুটি। কিন্তু প্রাথমিক মিশনে সাফল্য অর্জনের পরেও থেমে থাকেনি তারা, আরও দুটি গ্রহ ইউরেনাস এবং নেপচুন পরিদর্শনের পরিকল্পনাও ছিল জ্যোতির্বিদদের। দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় পুনরায় প্রোগ্রামিং করে মহাকাশযান দুটির সক্ষমতা বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল; যা পৃথিবী ছাড়ার সময় তাদের যে সক্ষমতা ছিল তার থেকে বেশি।

চিত্র: ১৯৭৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরে ভয়েজার-১ এর তোলা সর্বপ্রথম একই ফ্রেমে থাকা পৃথিবী ও চাঁদের ছবি।ভয়েজার-১ তখন পৃথিবী থেকে প্রায় ৭.২৫ মিলিয়ন মাইল দূরে।

সৌরজগতের গ্রহগুলোর এক বিশেষ জ্যামিতিক বিন্যাসের সুযোগ নিতে ভয়েজার মিশনটি সাজানো হয়েছিল। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনের কক্ষপথে অবস্থানের এই বিশেষ বিন্যাস সাধারণত ১৭৫ বছর পর পর হয়ে থাকে, যেখানে গ্রহগুলোর মহাকর্ষ

বলের সহায়তা নিয়ে কোন মহাকাশযানের গতিবেগ বাড়ানো সম্ভব এবং কম শক্তি কাজে লাগিয়ে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহের নিকট যাওয়া যাবে। তবে খরচের বিষয়টি চিন্তা করে কেবল ভয়েজার-২ কেই ইউরেনাস ও নেপচুনের কাছে পাঠানো হবে এমনটা ঠিক করে দুটি ভিন্ন গতিপথে মহাকাশযান দুটি প্রেরণ করা হয়েছিল।

চারটি গ্রহ পর্যবেক্ষণের মিশনটিতে সাফল্য এনেছিল ভয়েজার-২ যা আর কোন মহাকাশযান দ্বারা করা হয়নি। সৌরজগতের গ্রহগুলোর জন্ম ও বিবর্তন বিষয়ক বেশ কিছু প্রশ্নের সমাধান দিয়েছে এই মহাকাশযান জুটি, সেই সাথে নতুন কিছু প্রশ্নের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এখন পর্যন্ত এদের যাত্রার সময় প্রায় ৪২ বছর। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ্যবই নতুন করে সাজানোর জন্য মহাকাশযান দুটি এখনও অবিরাম তথ্য সরবরাহ করে চলেছে।

চিত্র: ১৯৭৯ সালে ভয়েজার-২ থেকে তোলা বৃহস্পতি গ্রহের ছবি

এখন অবধি পৃথিবী থেকে সবচাইতে দূরে অবস্থানরত মানুষ-নির্মিত মহাকাশযান ভয়েজার-১, যেটি এখন ইন্টারস্টেলার স্পেসে রয়েছে। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে এর সাথে ইন্টারস্টেলার স্পেসে গিয়ে যোগ দেয় ভয়েজার-২। এ সম্পর্কে নাসা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় গত বছর ডিসেম্বরের ১০ তারিখে। আগস্ট মাস থেকেই জ্যোতির্বিদরা বুঝতে পারছিলেন যে মহাকাশযানটি হেলোপজের কাছাকাছি আছে এবং তারা এটি অতিক্রমের অপেক্ষায় ছিলেন।

হেলিওস্ফিয়ারের ভেতরের তুলনায় এর বাইরে অত্যন্ত শক্তিশালী কণা রয়েছে। ভয়েজার-২ তে থাকা দুটি যন্ত্রের মাধ্যমে এরকম শক্তিশালী কণার উপস্থিতি বুঝতে পেরেছিলেন। কম শক্তিশালী কণার উপস্থিতি হ্রাস পেতে পেতে একেবারে নাই হয়ে যাওয়া থেকে হঠাৎ করেই অত্যন্ত শক্তিশালী কণার উপস্থিতি থেকেই তারা অনুমান করছিলেন যে তা হেলিওপজ অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু ঘটনাটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ছিল কঠিন।

হেলিওস্ফিয়ার কোন আদর্শ গোলক নয়, বরং এটি সৌর বায়ুর সাথে তাল মিলিয়ে সংকুচিত আবার স্ফীত হতে থাকে। তাই তারা আরও অপেক্ষা করতে থাকেন। সেই সাথে বাইরে থেকে আগত শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ ক্রমে বাড়ছিল। ভয়েজার-১ এর ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল। তবে ভয়েজার-১ এর হেলিওস্ফিয়ার অতিক্রম করার অনেক আগেই এর একটি যন্ত্র যা সৌর বায়ু পরিমাপ করতে পারত তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভয়েজার-২ এর ক্ষেত্রে যন্ত্রটি এখনও সচল আছে।

এই যন্ত্র কাজে লাগিয়ে তারা বুঝতে পারছিলেন যে সৌর বায়ুর পরিমাণ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। নভেম্বরের ৫ তারিখের পর থেকে এটি কোন সৌর বায়ুর উপস্থিতি দেখায়নি। এর সাথে মহাজাগতিক রশ্মি এবং শক্তিশালী কণার উপস্থিতি বিষয়ক তথ্যগুলো থেকেই প্রমাণ

পাওয়া যায় যে, মহাকাশযানটি হেলিওস্ফিয়ার অতিক্রম করে গেছে। পৃথিবী থেকে এখন এর অবস্থান প্রায় ১১ বিলিয়ন মাইল।

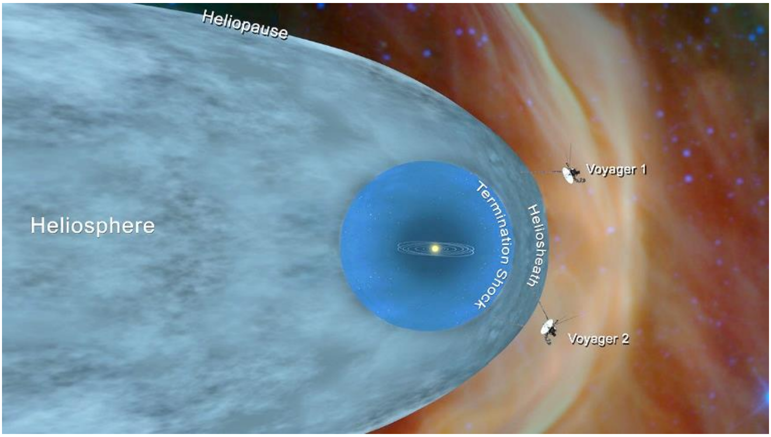

চিত্র: ভয়েজারের দুই যানই এখন সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অনন্তের পানে

ভয়েজার-১ যখন হেলিওপজ অতিক্রম করেছিল তখনকার প্রাপ্ত তথ্য থেকে ভয়েজার-২ থেকে প্রাপ্ত এখনকার তথ্যে বেশ বৈসাদৃশ্য রয়েছে যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিকট আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। তারা মনে করছেন যে মহাকাশযান দুটি হেলিওপজের দুটি ভিন্ন জায়গা দিয়ে অতিক্রম করেছে বলে এমনটা হয়েছে। তারা ধারণা করছেন মহাকাশযান দুটি আরও পাঁচ থেকে দশ বছর সচল থাকতে পারে। এই সময়ের মধ্যে তাদের মহাকাশযান দুটি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এতে করে মহাকাশ বিষয়ক অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র

1) https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/science/planetary-voyage/
2) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Heliosphere
3) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Interstellar_medium
4) www.engadget.com/amp/2018/12/10/nasa-voyager-2-entered-interstellar-space/
5) www.space.com/42680-voyager-2-reaches-interstellar-space.html

প্রায় সব রকমের ক্যান্সারের জন্যেই রয়েছে আলাদা আলাদা রঙের রিবন বা ফিতা। সচেতনতা বাড়াতে প্রচার-প্রচারণার কাজে এই রঙিন ফিতার ব্যবহার এখন বহুল প্রচলিত। প্রতিটা রঙই সেই বিশেষ ধরণের ক্যান্সারের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন: স্তন ক্যান্সারের জন্যে ব্যবহার করা হয় গোলাপী রঙের ফিতা। ব্রেইন ক্যান্সারের জন্যে আছে ধূসর ফিতা। মস্তিষ্কসহ স্নায়ুতন্ত্রের গ্রে ম্যাটারকে মাথায় রেখে এ রঙ বাছাই করা হয়েছে। মূত্রথলির ক্যান্সারের জন্যে বরাদ্দ আছে হলুদ রঙের ফিতা। ব্লাড ক্যান্সারের জন্যে কমলা। এরকম প্রায় ২৫ রকমের ক্যান্সারের জন্যেই রয়েছে নানা রঙের ফিতা। *(হাসনাত বিন জুবায়ের)*

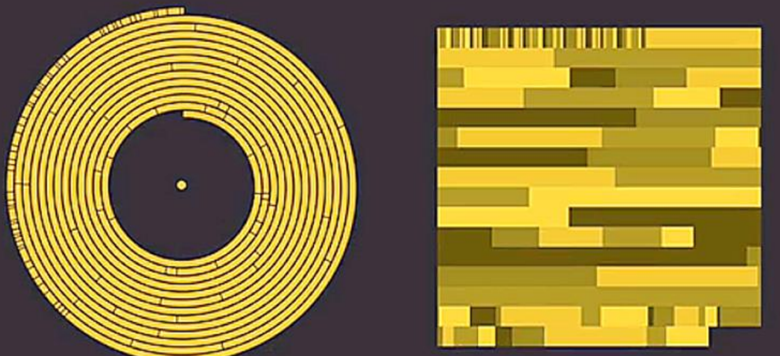

মহাকাশ

ভীনগ্রহীদের জন্যে মানুষের পাঠানো গোল্ডেন রেকর্ড

তরিকুল ইসলাম রাজু

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, শাবিপ্রবি, সিলেট

facebook.com/torikul.phy

গোল্ডেন রেকর্ড নামটায় যেমন জৌলুসময় ভাব আছে তেমনি এর কাজটাও মহান। পৃথিবীর বার্তা নিয়ে নিরন্তর পথ চলা। কোনো এক বুদ্ধিমান আগুন্তুকের অপেক্ষায় আমৃত্যু অসীমের দিকে যার যাত্রা।

গোল্ডেন রেকর্ড হল সোনার প্রলেপযুক্ত তামার তৈরি ফোনোগ্রাফ যা ভয়েজার-১ ও ভয়েজার-২ এর সাথে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। ভয়েজার মানুষের সৃষ্ট প্রথম বস্তু যা সৌরজগতের সীমা পাড়ি দিয়ে মহাকাশে প্রায় ৩৭ হাজার মাইল/ঘণ্টা বেগে এখনো ছুটে চলছে। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭৭ সালে।

মহাবিশ্বে মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ভয়েজারে সাথে গোল্ডেন রেকর্ডকে যুক্ত করে দেয়া হয়। এতে এমন কিছু বার্তা জুড়ে দেয়া হয়েছে যেন বাইরের গ্যালাক্সির কোন বুদ্ধিমান প্রাণী এর পাঠ উদ্ধার করতে পারলে পৃথিবী ও মানবজাতি যেন সম্পর্কে সাম্যক ধারণা পায়।

১২ ইঞ্চির এই ফোনোগ্রাফে তথ্য সংযুক্তি টিমের তত্ত্বাবধানে ছিলেন মহাকাশ বিজ্ঞানী কার্ল সেগান। ফোনোগ্রাফটিতে যুক্ত করে দেয়া হয় সাধারণ কিছু অডিও ও ১১৫টি এনকোডেড ইমেজ। ফোনোগ্রাফটির সাথে আছে সুঁচ ও কার্তুজ এবং এর কাভারে জুড়ে দেয়া হয় কিছু নকশা।

চিত্র: ভয়েজার মহাকাশযানের সাথে দেয়া গোল্ডেন রেকর্ড

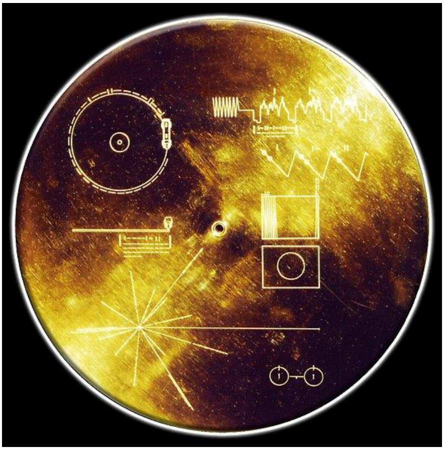

চিত্র: গোল্ডেন রেকর্ড (অপর পিঠ)

এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আমরা অনেকেই ফোনোগ্রাফ নেড়েচেড়ে দেখিনি। এটি কী? কীভাবে কাজ করে তা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক। ফোনোগ্রাফ হল অডিও রেকর্ড করার ডিস্ক।

আমরা জানি, শব্দ মাধ্যমের কণার কম্পনের ফলে তৈরি হয়। কম্পনের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শব্দ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাহলে বিভিন্ন রকম শব্দের জন্য আমরা বিভিন্ন রকম ধারাবাহিক কম্পনের প্যাটার্ন পাই। যন্ত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বেগে ঘুরিয়ে শব্দগুলোর জন্য উৎপন্ন কম্পনকে গ্রাফে প্লট করা হয়। সেই কম্পনের প্যাটার্ন অনুযায়ী ফোনোগ্রাফের পৃষ্ঠ খুবই ক্ষুদ্র মাত্রায় সূক্ষ্মভাবে খাঁচ কেটে তৈরি করা হয়। যখন আবার কার্তুজের সাথে সুঁচ লাগিয়ে ফোনোগ্রাফটিকে সেই নির্দিষ্ট কৌণিক বেগে ঘুরানো হয় তখন সেই একই প্যাটার্নে মাধ্যমের কণার কম্পনের ফলে একই শব্দমালার সৃষ্টি হয়।

মজার ব্যাপার হল ১১৫টি ইমেজকেও অডিওরূপে ফোনোগ্রাফে জুড়ে দেয়া হয়। কেন এমন করা হল তা অনুধাবন করতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে সময়টা ছিল ১৯৭৭। ইমেজকে অডিও করার প্রক্রিয়াটিও বেশ চমৎকার। ইমেজগুলোকে একটি পর্দায় ফেলা হয় এবং টেলিভিশন ক্যামেরা দ্বারা তা রেকর্ড করা হয়। তারপর ভিডিও সংকেতকে অডিওতে রূপান্তরিত করা হয়।

তাহলে গোল্ডেন রেকর্ডের পাঠ উদ্ধার করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে কত গতিতে ফোনোগ্রাফকে ঘুরাব। ভিনগ্রহের প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা যাচাই করার জন্য বিজ্ঞানীরা গোল্ডেন রেকর্ডের কাভারে নকশা করে জুড়ে দেয় কিছু ধাঁধা। যা সমাধান করতে পারলে তারা বুঝে যাবে কত গতিতে ফোনোগ্রাফকে ঘুরাতে হবে এবং কিভাবে অডিও থেকে ইমেজ ডিকোড করা যাবে। নিচে ছবিটি হল সেই ধাঁধা।

এই নকশাগুলো যুক্ত করে দেয়ার উদ্দেশ্য মোটেও তাদের বুদ্ধিমত্তা যাচাই করা না, বরং সহজ বোধ্য করার জন্য দেয়া হয়েছে। মজার ব্যাপার হল আমরা জানি না বাইরের

গ্যালাক্সির কোন বুদ্ধিমান প্রাণী কি ভাষায় তথ্য আদান প্রদান করে। চিন্তা করেন, আপনি চীনে কোন রেস্টুরেন্টে গিয়ে ওয়েটারের থেকে বাঙলায় দুই গ্লাস পানি চাচ্ছেন। লোকটা বাংলা না জানলে মোটেও আপনার কথা বুঝবে না। বুঝানোর জন্য অবশ্যই অন্য কোন উপায় বের করতে হবে। দেশ পেরিয়ে বিদেশ গেলেই যদি এমন অবস্থা হয় বাইরের গ্যালাক্সিতে কীভাবে কী হবে তাও ভেবে দেখতে হয়েছে।

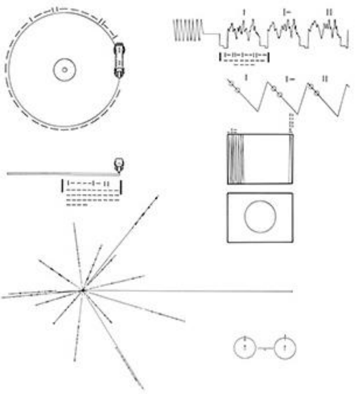

চিত্র: ভীনগ্রহের প্রাণিদের বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের জন্যে ফোনেগ্রাফের সাথে ধাঁধা জুড়ে দেয়া হয়

তাহলে আমরা তাদের কীভাবে বলে দেব কী করতে হবে! তখন বিজ্ঞানীরা অনেক চিন্তা করে এই উপায়টা বের করলেন। যেহেতু গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান মহাবিশ্বে একই তাই তারা তথ্য গুলো উদ্ধার করার উপায় চিত্র এঁকে গণিত ও পদার্থের মাধ্যমে বলে দিলেন। এর সাথে আরো যুক্ত করে দিলেন একটি মানচিত্র যেন তারা ধারণা করতে পারে কোথা থেকে রেকর্ডটি প্রেরণ করা হয়েছে। এই মানচিত্র থেকে পৃথিবীর অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এখানে বাম পাশের নিচের চিত্রটা সেই মানচিত্র। পৃথিবীর নিকটবর্তী ১৪ টি নিউট্রন তারার অবস্থান ও পালসিং ফ্রিকুয়েন্সির সাপেক্ষে মহাবিশ্বে পৃথিবীর অবস্থান সম্পর্কে এই নির্দেশনা দেয়া হয়।

ডান পাশে উপরের চিত্রটি একটি অডিওকে ইমেজে রূপান্তরিত করে দেখান হয়েছে। বাম পাশের উপরের দুটি চিত্র ফোনগ্রাফের রেকর্ড সম্পর্কে তথ্য দেয়া আছে আর ডানে নিচের ছবিটি সবথেকে গুরুতপূর্ণ তথ্য দেয়া আছে।

চলুন, এবার দেখি কিভাবে প্রদত্ত নকশা থেকে তথ্য উদ্ধার করব। না থাক, এরচে বরং নিজেকে একবার ভিন গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণী বিবেচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করে দেখুন। ইমেজ ডিকোড করতে পুরনো টেলিভিশন (ক্যাথোড রে টিউব) কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এবার তাহলে জেনে নেই কি আছে এই গোল্ডেন রেকর্ডে। অডিও এর মধ্যে রয়েছে মিউজিক,পৃথিবীর কিছু শব্দ (বাতাস-ঢেউ-বৃষ্টির শব্দ,পাখির কূজন, মেঘের বজ্রধ্বনি ইত্যাদি), ৫৫ টি ভাষায় অভিবাদন। বাংলায় বলা অভিবাদনটি হল 'নমস্কার, বিশ্বে শান্তি হোক'।

১১৫টি ইমেজে পৃথিবীর মানুষের অবয়ব, পৃথিবীর পরিবেশগত আচরণ, পৃথিবী বা সৌরজগতের মহাজাগতিক অবস্থান,মানুষের দৈনন্দিন জীবন, পশু,পাখী,পোকামাকড়, ডিএনএ সম্পর্কিত ইত্যাদি ধারণা দেয়া হয়েছে। ইমেজগুলোকে গল্পেরমতো করে সাজানো হয়েছে। ইমেজ ও অডিও দেখতে নিচের লিংক থেকে ঘুরে আসতে পারেন-

https://voyager.jpl.nasa.gov/golden-record/whats-on-the-record/

তথ্যসূত্র: নাসা, বিগ থিংক